বেগম রোকেয়া ॥ অবরোধ-বাসিনী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

অবরোধ-বাসিনী

বেগম রোকেয়া

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৮৮

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪১২ ডিসেম্বর ২০০৫

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
চৈত্র ১৪১৮ এপ্রিল ২০১২

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0187-6

ABORODH-BASHINI by Begum Rokeya :
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000 Bangladesh.
Cover Design : Dhroub Esh, First Edition December 2005. Price Tk. 60 Only.

বেগম রোকেয়া ও 'অবরোধ-বাসিনী'

বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁদের পরিবারটি এলাকাতে সম্ভ্রান্ত হিসেবে পরিচিত ছিল। সেই সময় আভিজাত্যের অন্যতম মাপকাঠি ছিল শিক্ষা। বেগম রোকেয়ার পিতৃ-পরিবারেও শিক্ষার প্রচলন ছিল। তবে তা ছিল পুরুষ-সদস্যদের জন্য নির্ধারিত। আর শিক্ষা বলতে বোঝানো হতো উর্দু ও ইংরেজি শিক্ষা। কদাপি বাংলা নয়। পিতা আবু আলী সাবের ছিলেন যথেষ্ট রক্ষণশীল। বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই ধরনের পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা বলতে বোঝানো হতো টিয়াপাখির মতো কোরআন শরিফ পাঠ। অর্থাৎ অর্থ না-বুঝে শুধু কোরআন তেলওয়াত করতে শেখা, নামাজ-রোজা এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা, রন্ধনবিদ্যা, সূচিকর্ম, আদব-কায়দা-সহবত সম্পর্কে শিক্ষা, স্বামী বা অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখতে পারার মতো ভাষাজ্ঞান (তা-ও বাংলা নয়) এবং বড়জোর দুই-একটি উর্দু-ফারসি পুঁথি-পুস্তক পাঠের ক্ষমতা।

এইরকম পরিবারে জন্ম নিয়ে ও বেড়ে উঠেও যে বেগম রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি পড়তে-লিখতে শিখেছিলেন, তার পেছনে প্রভাবকের ভূমিকা ছিল বড়বোন করিমুন্নেসা ও বড়ভাই ইব্রাহিম সাবেরের। ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পূর্বপর্যন্ত অগ্রজ দুই ভাইবোনের সহযোগিতায় বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হয়েছিলেন রোকেয়া বেগম (পারিবারিক নাম)। তাঁর বিদ্যানুরাগ আরো বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের অনুপ্রেরণায়। উর্দুভাষী ও বিপত্নীক এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্ত্রীকে শিক্ষা ও সাহিত্যসাধনায় উদার অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার প্রথম গ্রন্থ 'মতিচুর' প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। স্বামীর মৃত্যুর পরে (১৯০৯) বেগম রোকেয়া সাহিত্যসাধনা ও শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে—'*মতিচুর*' (দ্বিতীয় খণ্ড), '*Sultana's Dream*', '*পদ্মরাগ*', '*অবরোধ-বাসিনী*'। *অগ্রন্থিত গল্প, প্রবন্ধ,* রসরচনার মোট সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। এছাড়া তিনি তৎকালীন সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে কিছু কবিতাও লিখেছিলেন।

অনেকের ধারণা বেগম রোকেয়াই বাংলাদেশে প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃত ঘটনা তা নয়। বেগম রোকেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় স্থাপিত হয়েছিল ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুল। তারপর কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল আরো দুইটি বালিকা বিদ্যালয়। কলকাতার প্রথম গার্লস

স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে। স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাববেগম ফেরদৌস মহল। অপর স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন সোহরাওয়ার্দি পরিবারের খুজিস্তা আখতার বানু। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৯ সাল। ভারতবর্ষের তদানীন্তন ভাইসরয়ের পত্নী লেডি মিন্টো এই স্কুলটি উদ্বোধন করেছিলেন।

আবার বাঙালি মুসলমান নারীদের মধ্যে সাহিত্যসাধনায় অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম নন। তাঁর আগেই পত্রপত্রিকায় লিখেছেন আজিজুন্নেসা খাতুন, ফয়জুন্নেসা, তাহেরন নেছা, লতিফন নেছা প্রমুখ।

বেগম রোকেয়ার কৃতিত্ব প্রথমত্বে নয়, অনন্যত্বে। তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান রমণী যিনি সমাজ-সাহিত্য-শিক্ষা-নারীস্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আধুনিক নারীবাদী ধারণাটির উৎপত্তির অনেক আগেই তিনি এদেশে সুস্থ নারীবাদী চিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত লেখক। রমণীদের লেখা বলে সাহিত্যগুণহীন রচনাকেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাকে সাহিত্যিক পঙ্‌ক্তি বা পত্রপত্রিকায় স্থান দেবার যে 'পুরুষতান্ত্রিক করুণা' প্রদর্শনের প্রবণতা বিরাজমান ছিল, বেগম রোকেয়া তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এই সাহস তাঁর ছিল কারণ তাঁর রচনা ছিল প্রকৃতপক্ষেই সাহিত্যিক রচনা। এই কারণেই বেগম রোকেয়া এখনো প্রাসঙ্গিক।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসানও রয়েছেন, 'অবরোধ-বাসিনী'-ই বেগম রোকেয়ার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। লক্ষণীয়, তাঁরা এটিকে বলেছেন 'গ্রন্থ'। গল্প, রম্যরচনা, রিপোর্টাজ, রচনাসাহিত্য—কোনোটাই বলেননি। আধুনিক সমালোচকরা এই ধরনের লেখাগুলোকে 'অনুগল্প' আখ্যা দিয়েছেন। এই আখ্যা মেনে নিতে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই। তবে বনফুলের রচিত অনুগল্প কিংবা বিদেশী সাহিত্যে আন্তন চেখভ বা ফ্রান্‌জ কাফকার অনুগল্পের পাশাপাশি 'অবরোধ-বাসিনী'র রচনাগুলো স্থাপন করলে কিছু পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। সেই পার্থক্য মূলত এদের মেজাজের ভিন্নতায় এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদনায়। অন্যদের অনুগল্প যেখানে প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র সৃষ্টি সেখানে বেগম রোকেয়ার এই রচনাগুলো একটি অপরটির পরিপূরক। মোট ৪৭টি অনুগল্প একসঙ্গে মিলে একটি অখণ্ড আবহ সৃষ্টি করেছে। এই গল্পগুলো পর্দাপ্রথার নামে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবর্ষীয় নারীদের লাঞ্ছনার বর্ণনা। ঘটনাগুলোর কিছু লেখিকার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের অভিজ্ঞতা, কয়েকটি আছে অন্যের কাছ থেকে শোনা, কয়েকটি অন্য লেখকের বর্ণনা থেকে নেওয়া। যেমন রায়বাহাদুর জলধর সেনের লেখা 'সেকালের পর্দ্দা' থেকে গৃহীত ঘটনা। অনেকের কাছে, বিশেষত এযুগের মানুষের কাছে, লেখাগুলোকে রম্যরচনা মনে হতে পারে, রসিকতার ছলে বলা গল্পও মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলো বাস্তব। পর্দাপ্রথার নামে আমাদের দেশে নারী নির্যাতনের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এখনো তার রেশ পুরোপুরি মুছে যায়নি। বেগম রোকেয়ার

সাহিত্যিক উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ, কিন্তু হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও তাঁর অন্তরের জ্বালাটি ঠিকই অনুভব করা যায়। সে কারণেই গ্রন্থের ভূমিকাতে বেগম রোকেয়া লিখেছেন—'কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া "অবরোধ-বাসিনী" রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশস্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থানে তাঁহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে।'

আলীগড় গার্লস হাইস্কুলের তৎকালীন সেক্রেটারি, শিক্ষাবিদ শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত।

এই প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে সভানেত্রীর অভিভাষণে বলেছিলেন—'শেখ সাহেব পর্দাকে "সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত" বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। "যন্ত্রণাদায়ক" হইলে অবলাগণ "বাবারে! মা'রে! মলুম রে! গেলুম রে!" বলিয়া আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন! অবরোধ-প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না। অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।'

সেই নীরব-ঘাতক পর্দাপ্রথার অনেক অমানবিক কাহিনী পাওয়া যায় 'অবরোধ-বাসিনী'তে। লেখিকার এক দূর-সম্পর্কিত মামিশাশুড়ি ট্রেনে ভাগলপুর থেকে পাটনা যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল একজন পরিচারিকা। কিউল স্টেশনে ট্রেন বদল করতে হয়। মামিশাশুড়ি অন্য ট্রেনে ওঠার সময় প্রকাণ্ড বোরকায় জড়িয়ে ট্রেন ও প্লাটফর্মের মাঝখানে পড়ে গেলেন। কুলিরা তাকে তোলার জন্য এগিয়ে এলে পরিচারিকা ধর্মের দোহাই নিয়ে অনুরোধ জানায় কোনো পুরুষ যেন বিবিসাহেবার শরীর স্পর্শ না করে। সেই পরিচারিকা একাকী টেনে তুলতেও পারে না তার বিবিসাহেবাকে, আবার কাউকে সাহায্য করতেও দেয় না। এই অবস্থায় ট্রেন ছেড়ে দিলে বিবিসাহেবার দেহ থ্যাঁতলা হয়ে যায়। তারপর এগার ঘণ্টা সেই অবস্থায় পড়ে থেকেই তার করুণ মৃত্যু।

বিহার অঞ্চলে বিবাহের তিন মাস আগে কনেকে 'মাইয়াখানা'য় আবদ্ধ করে রাখা হতো। যদি কোনো কারণে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে যেত, তাহলেও তাকে তার মাইয়াখানা থেকে বের করা হতো না। একজন মেয়েকে একনাগাড়ে ছয়মাস এভাবে রাখা হয়েছিল। সেই সময় মেয়েদের মাটিতে পা ছোঁয়ানো বারণ। তাকে গোসল করাতে হলে কোলে করে স্নানাগারে নিয়ে যাওয়া হতো। কেউ খাবার না এনে দিলে সে খেতে পেত না। সমস্ত দিন মাথা গুঁজে তাকে একটা খাটিয়ার উপর বসে থাকতে হতো, রাতে ঘুমাতেও হতো সেখানে। অপরে মুখে তুলে তাকে খাবার খাওয়ায়, পানি খাওয়ায়। ছয়মাস পর সেই মেয়েটির বিবাহ সম্পন্ন হল। তখন দেখা গেল যে, অন্ধকার বায়ুরোধী ঘরে সর্বদা চোখ বুঁজে থাকার ফলে তার দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।

লেখিকা দেখিয়েছেন যে, এই পর্দার নামে বাড়াবাড়ি শুধু মুসলমান সমাজে নয়, হিন্দু সমাজেও একই সমান্তরালে বিরাজ করছিল। কোনো মহিলাকে পালকিতে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় পর্দার যে ব্যবস্থা করা হতো তা লেখিকার জবানিতেই শোনা যাক—'তাঁহাদের প্রত্যেককে পাল্কীতে বিছানা পাতিয়া, একটা তালপাতার হাতপাখা, এক কুজা পানি এবং একটা গ্লাসসহ বন্ধ করা হয়। পরে সেই পাল্কীগুলি তাঁহাদের পিতা কিম্বা পুত্রের সম্মুখে চাকরেরা যথাক্রমে—(১) বনাতের পর্দা দ্বারা প্যাক করে; (২) তাহার উপর মোম-জমা কাপড় দ্বারা সেলাই করে; (৩) তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে; (৪) তাহার পর বোম্বাই চাদরের দ্বারা সেলাই করে; (৫) অতঃপর সর্ব্বোপরে চট মোড়াই করিয়া সেলাই করে।...অতঃপর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পর, পুনরায় পুরুষ অভিভাবকের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে পাল্কীগুলির সেলাই খোলা হয়। সেলাই খুলিয়া পাল্কীগুলি বনাতের পর্দা ঢাকা অবস্থায় রাখিয়া চাকরেরা সরিয়া যায়। পরে কর্ত্তা স্বয়ং এবং বাড়ীর অপর আত্মীয় এবং মেয়েমানুষেরা আসিয়া পাল্কীর কপাট খুলিয়া মুমূর্ষু বন্দিনীদের অজ্ঞান অবস্থায় বাহির করিয়া যথারীতি মাথায় গোলাপজল ও বরফ দিয়া, মুখে চামচ দিয়া পানি দিয়া, চোখে মুখে পানির ছিটা দিয়া বাতাস করিতে থাকেন। দুই ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ের শুশ্রূষার পর বিবিরা সুস্থ হন।'

বেগম রোকেয়া তার প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য মোটর বাস তৈরি করলেন। বাসের পেছনের দরজার উপরে সামান্য একটু নেট দেওয়া আছে। বাসের সম্মুখদিকে ও উপরেও একটু নেট দেওয়া আছে। তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড়ফুট লম্বা নেটের টুকরো দুটো না থাকলে বাসটিকে পুরোপুরি এয়ারটাইট বলা যেত।

প্রথমদিন গাড়িতে উঠে মেয়েরা গরমে অস্থির হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বমি করে। আলোর অভাবে ভয় পেয়ে ছোট মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে।

পরদিন বাসের দরজার উপরের খড়খড়ি খুলে দিয়ে সেখানে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তবুও পথের মধ্যে গরমে তিনজন অজ্ঞান, চারজন বমি করেছে, বাকিদের প্রচণ্ড মাথাব্যথা।

এবার দুই পাশের দুইটি খড়খড়ি খুলে দিয়ে সেখানে কাপড়ের পর্দা ঝোলানো হল। সেইদিনই ডাক মারফত চারটি চিঠি এল বেগম রোকেয়ার কাছে। বেনামি চিঠি। চিঠিতে বলা হয়েছে যে, মোটরের দুই পাশে পর্দা দেওয়া হয়েছে বটে, তবে গাড়ি চলার সময় সেগুলো বাতাসে ওড়ে, ফলে গাড়িটা বে-পর্দা হয়ে যায়। যদি আগামীকালের মধ্যে সঠিকভাবে পর্দার বন্দোবস্ত না করা হয়, তাহলে এই বাস যাতে রাস্তায় না চলতে পারে, সে ব্যবস্থা তারা করবেন।

গ্রন্থভুক্ত ৪৭টি গল্প বেগম রোকেয়া পরিবেশন করেছেন পরিহাসের ভঙ্গিতে, কিন্তু সেগুলোতে তাঁর অন্তরের বেদনা, কখনো কখনো ঘৃণাও, চাপা থাকেনি। কেননা, তিনি এই অবরোধপ্রথার পেছনে ধর্মাচরণের নামে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

আমরা জানি, বেগম রোকেয়া নিজে যথেষ্ট শালীন ও পর্দানশিন জীবনযাপন করেছেন। তিনি স্কুল পরিদর্শনে আগত সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল-পরিদর্শক কিংবা ছাত্রীদের পুরুষ অভিভাবকদের সাথে পর্দার আড়ালে বসেই তাঁর একান্ত দরকারি আলোচনা সেরে নিতেন। কিন্তু তাঁর জীবনীকার বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের মতে বেগম রোকেয়া এগুলো করতেন বাধ্য হয়ে। তা না হলে তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। তবে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, পর্দার ক্ষেত্রে তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিশীলিত অবস্থানের পক্ষে ছিলেন। তিনি 'বোরকা' প্রবন্ধে এই ব্যাপারে তাঁর মতামত সবিস্তারে প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—'পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই "বে-পর্দা" বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমত পোশাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।...সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন। কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়।...নববধূদের অন্যায় পর্দাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই চারি মাস কেবল "জড় পুত্তলিকা" সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন!

...ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে।...পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত।... এই যে "গয়ের মজহব" বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পর্দা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে।...আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।'

'অবরোধ-বাসিনী'র গল্পগুলো ১৩৩৫-এর কার্তিক, ১৩৩৬-এর ভাদ্র, ১৩৩৭-এর শ্রাবণ ও ১৩৩৭-এর ভাদ্র সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার 'মহিলা মহফিল'-এ ছাপা হয়। প্রকাশের পরে কেউ কেউ এগুলোর বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এগুলোকে 'অতিরঞ্জিত উপকথা' বলেও কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছিলেন। উত্তরে বেগম রোকেয়া বলেছিলেন—'শুনিলাম কেহ কেহ বলিতেছেন, অবরোধ-বাসিনীর ঘটনাগুলি অনেক জায়গায় এতই আজগুবি যে, সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আমি নিজে জানি যে, ইহার একটি অক্ষরও সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই।'

—জাকির তালুকদার

নিবেদন

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুস সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া "অবরোধ-বাসিনী" রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশ স্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন কোন স্থলে তাঁহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা 'তাহেরা' মরহুমার অকালমৃত্যুতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইনস্‌পেক্টর পরম ভক্তিভাজন জ্ঞান-বৃদ্ধ মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বি.এ.এম.এল.সি. দয়া করিয়া "অবরোধ-বাসিনী"র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।

হজরত রাবিয়া বসরী বলিয়াছেন, "ইয়া আল্লাহ্! যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর; আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করি তবে আমার জন্য বেহেশত হারাম হউক।" আল্লাহর ফজলে সমাজসেবা সম্বন্ধে আমিও এখন ঐরূপ বলিতে সাহস করি।

আমার ত প্রত্যেকটি লোম গুনাহগার; সুতরাং পুস্তকের দোষ-ত্রুটির জন্য এবার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম না।

বিনীতা—
গ্রন্থকর্ত্রী

ভূমিকা

"অবরোধ-বাসিনী" লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তাধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন; কিন্তু পাক-ভারতের অবরোধ-বাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেন নাই।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বারম্বার এই কথাই মনে পড়ে,—আমরা কোথা হইতে আসিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছি! যে মুসলিম সমাজ এককালে সমস্ত জগতের আদর্শ ছিল, সেই সমাজের এক বিরাট অংশ এখন প্রায় সমস্ত জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

কোথায় বীরবালা খাওলা ও রাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক পুরুষ-যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন আর কোথায় বঙ্গীয় মুসলিম নারী চোরের হস্তে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "অবরোধ-বাসিনী" পাঠে ঘুমন্ত জাতির চিন্তা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

সর্বশেষে লেখিকাকে এই সৎসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাই। "অবরোধ-বাসিনীর" প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আবদুল করিম (বি. এ., এম. এল. সি.)

অবরোধ-বাসিনী

আমরা বহুকাল হইতে অবরোধে থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি; সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের—বিশেষত আমার কিছুই নাই। মেছোনিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "পচা মাছের দুর্গন্ধ ভালো না মন্দ?" সে কী উত্তর দিবে?

এস্থলে আমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিব—আশা করি তাঁহাদের ভালো লাগিবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরানি ব্যতীত অপর কোনো স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না।

বিবাহিতা নারীগণও বাজিকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাশাওয়ালি স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পরদা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশি পরদা করিয়া গৃহকোণে যত বেশি পেচকের মতো লুকাইয়া থাকিতে পারেন তিনিই তত বেশি শরিফ।

শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারি মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম তো মেম—শাড়ি-পরিহিতা খ্রিস্টান বা বাঙালি স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।

[১]

সে অনেক দিনের কথা। রংপুর জিলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমিদার-বাড়িতে বেলা আন্দাজ ১টা-২টার সময় জমিদার-কন্যাগণ জোহরের নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। সকলের ওজু শেষ হইয়াছে, কেবল "আ" খাতুন নাম্নী সাহেবজাদি তখনও আঙিনায় ওজু করিতেছিলেন। আলতার মা বদনা হাতে তাঁহাকে ওজুর জন্য পানি ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় এক মস্ত লম্বাচৌড়া কাবুলি স্ত্রীলোক আঙিনায় আসিয়া উপস্থিত! হায়, হায়, সে কী বিপদ! আলতার মা'র হাত হইতে বদনা পড়িয়া গেল—সে চেঁচাইতে লাগিল—"আউ আউ! মরদটা কেন আইল!" সে স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল, "হেঁ মরদানা! হাম্

মরদানা হায়?" সেইটুকু শুনিয়াই "আ" সাহেবজাদি প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার চাচিআম্মার নিকট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "চাচিআম্মা! পায়জামা পরা একটা মেয়েমানুষ আসিয়াছে!" কর্ত্রীসাহেবা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমাকে দেখিয়াছে?" "আ" সরোদনে বলিলেন, "হাঁ!" অপর মেয়েরা নামাজ ভাঙিয়া শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন—যাহাতে সে কাবুলি স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ-ভালুকের ভয়েও বোধ হয় অমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।

[২]

ইহাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পাটনায় এক বড়লোকের বাড়িতে শুভ-বিবাহ উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিতা মহিলা আসিয়াছেন। অনেকে সন্ধ্যার সময়ও আসিয়াছেন। তন্মধ্যে হাশমত বেগম একজন। দাসী আসিয়া প্রত্যেক পালকির দ্বার খুলিয়া বেগম- সাহেবাদের হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া যাইতেছে, পরে বেহারাগণ খালি পালকি সরাইয়া লইতেছে এবং অপর নিমন্ত্রিতার পালকি আসিতেছে। বেহারা ডাকিল—"মামা! সওয়ারি আয়া!" মামারা মন্থর গমনে আসিতেছে। মামা যতক্ষণে হাশমত বেগমের পালকির নিকট আসিবে ততক্ষণে বেহারাগণ সওয়ারি নামিয়াছে ভাবিয়া পালকি লইয়া সরিয়া পড়িল। অতঃপর আর একটি পালকি আসিলে মামারা পালকির দ্বার খুলিয়া যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাকে লইয়া গেল।

শীতকাল। যত পালকি আসিয়াছে 'সওয়ারি' নামিলে পর সব খালি পালকি একপ্রান্তে বটগাছের তলায় জড়ো করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদূরে বেহারাগণ ঘটা করিয়া রান্না করিতেছে। তাহারা বিবাহবাড়ি হইতে জমকালো সিধা পাইয়াছে। রাত্রিকালে আর সওয়ারি খাটিতে হইবে না। সুতরাং তাহাদের ভারি স্ফূর্তি—কেহ গান গায়, কেহ তামাক টানে, কেহ খইনি খায়—এইরূপে আমোদ করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল।

এদিকে মহিলা-মহলে নিমন্ত্রিতাগণ খাইতে বসিলে দেখা গেল—হাশমত বেগম তাঁহার ছয় মাসের শিশুসহ অনুপস্থিত। কেহ বলিল, ছেলে ছোট বলিয়া হয়তো আসিলেন না। কেহ বলিল, তাঁহাকে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছে—ইত্যাদি।

পরদিন সকালবেলা যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাগণ বিদায় হইতে লাগিলেন—একে একে খালি পালকি আসিয়া নিজ নিজ 'সওয়ারি' লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি 'খালি' পালকি আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার দ্বার খুলিয়া দেখা গেল হাশমত বেগম শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন! পৌষ মাসের দীর্ঘ রজনী তিনি ঐভাবে পালকিতে বসিয়া কাটাইয়াছেন!

তিনি পালকি হইতে নামিবার পূর্বেই বেহারাগণ পালকি ফিরাইয়া লইয়া গেল—কিন্তু তিনি নিজে তো শব্দ করেনই নাই—পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর বেহারা

শুনিতে পায়, শিশুকেও প্রাণপণ যত্নে কাঁদিতে দেন নাই—যদি তাহার কান্না শুনিয়া কেহ পালকির দ্বার খুলিয়া দেখে! কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আর অবরোধ-বাসিনীর বাহাদুরি কী?

[৩]

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বের ঘটনা। কয়েক ঘর বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত জমিদারের মাতা, মাসি, পিসি, কন্যা ইত্যাদি একত্রে হজ করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় ২০।২৫ জন ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছিলে পর সঙ্গের পুরুষপ্রভুগণ কার্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। বেগমসাহেবাদিগকে একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় পুরুষের হেফাজতে রাখা হয়। সে ভদ্রলোকটিকে লোকে হাজিসাহেব বলিত, আমরাও তাহাই বলিব। হাজিসাহেব বেগমসাহেবাদের ওয়েটিংরুমে বসাইতে সাহস পাইলেন না। তাঁহার উপদেশমতে বিবিসাহেবারা প্রত্যেকে মোটা মোটা কাপড়ের বোরকা পরিয়া স্টেশনের প্লাটফরমে উবু হইয়া (Squat) বসিলেন ; হাজিসাহেব মস্ত একটা মোটা ভারী শতরঞ্জি তাঁহাদের উপর ঢাকিয়া দিলেন। তদবস্থায় বেচারিগণ এক একটা বোচকা বা বস্তার মতো দেখাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া হাজিসাহেব এক কোণে দাঁড়াইয়া খাড়া পাহারা দিতেছিলেন। একমাত্র আল্লাহ্ জানেন, হজযাত্রী বিবিগণ ঐ অবস্থায় কয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছিলেন—আর ইহা কেবল আল্লাহ্তালারই মহিমা যে তাঁহারা দম আটকাইয়া মরেন নাই।

ট্রেন আসিবার সময় জনৈক ইংরাজ কর্মচারী ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে হাজিসাহেবকে বলিলেন, "মুন্সি! তোমরা আসবাব হিয়াছে হাটা লো। আভি ট্রেন আবেগা—প্লাটফরম পর খালি আদমি রহেগা—আসবাব নেহি রহেগা!" হাজিসাহেব জোড়হস্তে বলিলেন, "হুজুর, ঐসব আসবাব নাহি—আওরত হায়।" কর্মচারীটি পুনরায় একটা 'বস্তায়' জুতার ঠোকরা মারিয়া বলিলেন, "হা, হা—এইসব আসবাব হাটা লো।" বিবিরা পরদার অবরোধে জুতার গুঁতা খাইয়াও টুঁ শব্দটি করেন নাই।

[৪]

উড়িষ্যার অন্তর্গত রাজকণিকায় একজন ভদ্রলোক চাকরি উপলক্ষে ছিলেন। বাসায় তাঁহার মাতা, দুইজন ভগিনী এবং স্ত্রী ছিলেন। বর্ষার সময়। তাঁহার বাংলোয় চারিজন পাখাটানা কুলি পালাক্রমে সমস্ত দিন ও রাত্রি পাখা টানিত। সাহেব টুরে বাহিরে গিয়াছেন, রাত্রিকালে তাঁহার স্ত্রীর কামরায় একজন চাকরানি শুইয়াছেন। তাঁহার ভগিনীগণ অন্য কামরায় ছিলেন।

সে অঞ্চলে গরমের সময় লোকে বেশি বিছানা ব্যবহার করে না। রাত্রিকালে প্রবল বেগে বৃষ্টি হওয়ায় সাহেবের স্ত্রীর শীত বোধ হইল। তবু তিনি চাকরানিকে

ডাকিয়া পাখা বন্ধ করিতে বলিলেন না। ক্রমে শীত অসহ্য হওয়ায় প্রথমে তিনি বিছানার চাদরখানি গায়ে দিলেন, তাহাতেও শীত না গেলে তিনি বিছানার দরি (শতরঞ্জি) ও সুজনী তুলিয়া গায়ে দিলেন। কিন্তু হতভাগা পাখা-কুলি আরও জোরে পাখা টানিতে লাগিল। তখন অগত্যা বউ বিবি ঐ দরি চাদর সমস্ত গায়ে জড়াইয়া পালঙ্কের নিচে গিয়া শুইলেন!

পরদিন সকালে একজন চাকরানি কামরায় ঝাঁটা দিতে আসিয়া পালঙ্কের নিচে সাদা একটা কী দেখিয়া দিল ঝাঁটার বাড়ি—ঝাঁটার চোটে তাড়াতাড়ি বউ বিবি পাশ ফিরিলেন।—বেচারি চাকরানি যেন মরিয়া গেল!

[৫]

ই.আই. রেলযোগে কোনো বেহারি ভদ্রলোক সস্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। তিনি স্ত্রীকে লেডির কক্ষে না দিয়া নিজের সঙ্গেই রাখিলেন। তাঁহারা সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছিলেন। বেগমসাহেবা বোরকা পরিয়াই রহিলেন। একসময় সাহেব বাথরুমে থাকিতে ট্রেন কোনো স্টেশনে থামিল। অপর এক যাত্রী কোথাও স্থান না পাইয়া ঐ কক্ষে উঠিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া একটা জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিলেন। এদিকে পূর্বোক্ত সাহেব বাথরুম হইতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার স্ত্রী অনুপস্থিত! কী করিবেন—তখন চলন্ত ট্রেন। পরবর্তী স্টেশনে আগন্তুক ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন। আমাদের কথিত সাহেবও নামিয়া স্টেশনের পুলিশে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অমুক ও অমুক স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে হারাইয়াছে।

বেচারা পুলিশ বিভিন্ন স্টেশনে টেলিগ্রাম করিল যে কালো বোরকায় আবৃতা এক মহিলার খোঁজ করো। একজন কনেস্টবল বলিল, "একবার এই গাড়িখানাই ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখি না। যে বেঞ্চে সাহেব বসিয়াছিলেন, কনেস্টবল সেই বেঞ্চের নিচে কালো একটা কী দেখিতে পাইয়া টানিয়া বাহির করিবামাত্র সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন, "আরে ছোড়ো ছোড়ো—ওহি তো মেরা ঘর হায়!" পরে জানা গেল সেই নবাগত ভদ্রলোককে দেখিয়া উনি বেঞ্চের নিচে লুকাইয়া ছিলেন।

[৬]

ঢাকা জেলায় কোনো জমিদারের প্রকাণ্ড পাকা বাড়িতে দিনে-দুপুরে আগুন লাগিয়াছিল। জিনিসপত্র পুড়িয়া ছারখার হইল—তবু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব আসবাব সরঞ্জাম বাহির করার সঙ্গে বাড়ির বিবিদেরও বাহির করা প্রয়োজন বোধ করা গেল। হঠাৎ তখন পালকি, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে একসঙ্গে দুই-চারিটা পালকি কোথায় পাওয়া যাইবে? অবশেষে স্থির হইল যে একটা বড় রঙিন মশারির ভিতর বিবিরা থাকিবেন, তাহার চারিকোণ বাহির হইতে চারিজনে ধরিয়া লইয়া যাইবে।

তাহাই হইল,—আগুনের তাড়নায় মশারি ধরিয়া চারিজন লোক দৌড়াইতে থাকিল, ভিতরে বিবিরা সমভাবে দৌড়াইতে না পারিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া দাঁত, নাক ভাঙিলেন, কাপড় ছিঁড়িলেন। শেষে ধানক্ষেত দিয়া কাঁটাবন দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে মশারিও ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

অগত্যা আর কী করা যায়? বিবিগণ একটা ধানের ক্ষেতে বসিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যায় আগুন নিবিয়া গেলে পর পালকি করিয়া একে একে তাঁহাদের বাড়ি লইয়া যাওয়া হইল।

[৭]

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের জনৈক জমিদারের বাড়িতে বিবাহ হইতেছিল। অতিথি অভ্যাগতে বাড়ি গম্‌গম্‌ করিতেছে। খাওয়া-দাওয়ায় রাত্রি ২টা বাজিয়া গিয়াছে, এখন সকলের ঘুমাইবার পালা। কিন্তু চোর-চোট্টা তো ঘুমাইবে না—এই সুযোগ তাহাদের চুরি করার।

সিঁধ কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একজন চৌকিদার চোরের সাড়া পাইয়া বাড়ির কর্তাদিগকে সংবাদ দিয়াছে। কর্তারা ছিলেন, পাঁচ ছয় ভাই। তাঁহারা প্রত্যেকে কুঠার-হস্তে সে-ঘরটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন চোরের সন্ধানে! চোরকে পাইলে সে-সময় তাঁহারা কুঠার দিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেন। হুঁ—চোরের এত বড় আস্পর্ধা!

ঘরের ভিতর বিবিরা চোরকে দেখিয়া আরও জড়সড় হইয়া চাদর গায়ে দিয়া শুইলেন—একেবারে নীরব, যেন নিশ্বাস ফেলিবারও সাহস নাই। বিশেষত 'বেগানা মরদটা' যেন তাঁহাদের নিশ্বাসের শব্দও না শুনে। চোর নিঃশঙ্কচিত্তে সিন্দুক ভাঙিয়া নগদ টাকা গহনাপত্র বাহির করিয়া লইল। পরে একে একে প্রত্যেক বিবির হাত পায়ের গহনা খুলিয়া লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিবিরা তাড়াতাড়ি নাক, কান ও গলার অলঙ্কার খুলিয়া শিয়রে রাখিতে লাগিলেন। ইহাতে চোরের বেশ সুবিধাই হইল—সে আর অনর্থক বেগম খানমদের নাক বা গলা স্পর্শ করিবে কেন? সেই ঘরে একটি ছিল নূতন বউ—সে বেচারি নাকের নথটি তো খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কানের ঝুম্‌কা প্রভৃতি গহনাগুলি পরস্পরে জড়াইয়া বড় জটিল হইয়া পড়িল—কিছুতেই খোলা গেল না। চোর মহাশয় ভদ্রতার অনুরোধে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করার পর কলম-তারাশ ছুরি দিয়া বউ বিবির উভয় কান কাটিয়া লইয়া গহনার পুঁটুলিতে ভরিয়া সেই সিঁধ-পথে পলায়ন করিল।

ঘরের ভিতর এত কাণ্ড হইয়া গেল—বাহিরে পুরুষগণ কুঠার-হস্তে চোরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বিবিরা কেহ টুঁ শব্দ করিলেন না—পাছে 'বেগানা মরদটা' তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনে! চোর নিরাপদে বাহির হইয়া গেলে পর বিবিরা হাউমাউ আরম্ভ করিয়া দিলেন!

পাঠিকা ভগিনী! এইরূপ আমরা অবরোধ-প্রথার সম্মান রক্ষা করিয়া থাকি।

[৮]

এক বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাতবাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নিচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, কিন্তু পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য! কুল-কামিনীর অবরোধ!

[৯]

এক মৌলবি সাহেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং বিধবা অবশিষ্ট ছিলেন। মৌলবি সাহেব কিছু রাখিয়া যান নাই, সুতরাং অতি কষ্টে তাঁহার বিধবা সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহের জন্য বহু কষ্টে কতকগুলি অলঙ্কার গড়াইলেন। অলঙ্কারগুলি বেশ ভারী দামের হইল। বিবাহের দুই-তিন দিন পূর্বে সিঁধ কাটিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করিল। সে-ঘরে তিনি একমাত্র দাসীসহ শুইয়াছিলেন। চোরের সাড়া পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চুপি চুপি বাঁদিকে জাগাইলেন। চোর ভাবিল, সর্বনাশ—দেই দৌড়।

কিন্তু চোরের সঙ্গীরা বলিল, আচ্ছা, একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখি না কী হয়। হইল বেশ মজা—

বিবিসাহেবার সঙ্কেতমতো দাসী একখানা কাপড় দিয়া তাঁহার খাটের সম্মুখে পর্দা টাঙাইয়া দিল। পরে চাবির গোছা দেখাইয়া চোরদিগকে বলিল, "বাপু সকল! তোমরা এদিকে আসিও না, তোমরা যাহা চাও, আমি সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিয়া দিতেছি।" পরে সমস্ত দামি কাপড় ও অলঙ্কার বাহির করিয়া চোরের হাতে দিল। তাহারা গহনা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, "নথ কই?—সেটা সিন্দুকে আছে বুঝি?" কর্ত্রীর সঙ্কেত অনুসারে দাসী বলিল, "দোহাই! তোমরা এদিকে আসিও না—আম্মা সা'ব কেবল নথটা রাখিয়াছেন যে পরশুদিন বিয়া—একেবারে কোনো গয়না রহিল না—নথটাও না থাকিলে বিয়া হয় কী করিয়া? তা যদি তোমরা চাও, তবে নেও—নথ লও—পর্দার এদিকে আসিও না।"

চোরেরা ভারি খুশি হইয়া পরস্পর গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি তিনটা কি চারিটা। এত সহজে সিদ্ধিলাভ করায় আনন্দের আতিশয্যে তাহারা একটু জোরে কথা কহিয়াছিল। পথে চৌকিদার তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য তাড়া করে। সকলে পলাইল। একটি চোর হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় চৌকিদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অগত্যা সে চৌকিদারের সঙ্গে চুরি-করা বাড়ি দেখাইয়া দিতে গেল। ততক্ষণে ভোর হইয়াছে।

চৌকিদার গিয়া দেখে, বিবিসাহেবা তখনও পর্দার অন্তরাল হইতে বাহির হন নাই—"যদি ব্যাটারা আবার আসে"—তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে যে!

দাসীকেও চেঁচামেচি করিতে দেন নাই যে শোরগোল শুনিয়া যদি কোনো পুরুষমানুষ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করে। চোরের হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তিনি অবরোধ-প্রথার সম্মান রক্ষা করিলেন।

[১০]

কোনো জমিদার-গৃহিণী ছোট ভাইয়ের বউ আনিবার জন্য ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি গিয়াছেন। একদিন হঠাৎ গিয়া দেখেন নববধূকে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ ভাত খাওয়াইতেছেন। ভাতের বাসনে একটা কাঁচামরিচ ছিল। তিনি সরল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বউ ঝাল খাইতে ভালোবাসে নাকি?" বউয়ের ভাবীজান উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বড্ড ঝাল খায়!"

পরে তিনি বউ লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিলেন। পথে তিন-চারি দিন নৌকায় থাকা হইল। এই সময়ে তিনি যাহা কিছু রান্না করাইতেন, তাহাতেই অতিরিক্ত ঝাল দেওয়াইতেন। আসল কথা এই যে, বউ মোটেই ঝাল খাইতে অভ্যস্তা নহেন। খাইবার সময় কাঁচা লঙ্কার খোশবু শুঁকিয়া শুঁকিয়া ভাত খাইতেছিল। তাই ঠাট্টা করিয়া তাঁহার ভাবীজান ঝাল খাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। ফলে বেচারির প্রাণ লইয়া টানাটানি।

ননদ মহাশয় কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি মাখিয়া ভাই-বউকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। বউ-এর দুই চক্ষু বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত—মুখ জিহ্বা পুড়িয়া যাইত—তবু বড় ননদকে মুখ ফুটিয়া বলেন নাই যে, তিনি ঝাল খান না!! ও সর্বনাশ! একে নূতন বউ, তাতে বড় ননদ—প্রাণ গেলেও কথা কহিতে নাই!

[১১]

গত ১৯২৪ সালে আমি আরায় গিয়াছিলাম। আমার দুই নাতিনির বিবাহ একসঙ্গে হইতেছিল, সেই বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। নাতিনীদের ডাকনাম মঙ্গু ও সবু। বেচারিরা তখন "মাইয়াখানায়" ছিল। কলিকাতায় তো বিবাহের মাত্র ৫।৬ দিন পূর্বে "মাইয়াখানা" নামক বন্দিখানায় মেয়েকে রাখে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে ৬।৭ মাস পর্যন্ত এইরূপ নির্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েদের আধমরা করে।

আমি মঙ্গুর জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না—সে রুদ্ধগৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। শেষে একদিন একটা জানালা একটু খুলিয়া দিলাম। দুই মিনিট পরেই এক মাতব্বর বিবি, "দুলহিন্‌কো হাওয়া লাগেগী" বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলাম। আমি সবুদের জেলখানায় গিয়া মোটেই বসিতে পারিতাম না। কিন্তু সে বেচারিরা ছয় মাস হইতে সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে সবুর হিস্টিরিয়া রোগ হইয়া গেল। এইরূপে আমাদের অবরোধে বাস করিতে অভ্যস্ত করা হয়।

[১২]

পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধূ তাহার শাশুড়ি ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুড়ি ও স্বামীকে ভিড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হল্লা—সেই ভদ্রলোককে ধরিয়া কনস্টেবল বলে, "তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।" তিনি আচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন : আ রে! এ কাহার বউ পিছন হইতে তাঁহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে!—প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে—নিজের স্বামীকে সে কখনও ভালো করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে, এই ভদ্রলোকের ধুতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে।

[১৩]

আজিকার (২৮শে জুন, ১৯২৯) ঘটনা শুনুন। স্কুলের একটি মেয়ের বাপ লম্বা চওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে, মোটর বাস তাঁহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাঁহার মেয়েকে 'বোরকা' পরিয়া মামার (চাকরানির) সহিত হাঁটিয়া বাড়ি আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাঁহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের জনৈক শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দুভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই :—

"অনুসন্ধানে জানিলাম, হীরার বোরকায় চক্ষু নাই। (হীরাকা বোরকা মে আঁখ নেহি হায়।) অন্য মেয়েরা বলিল, তাহারা গাড়ি হইতে দেখে, মামা প্রায় হীরাকে কোলের নিকট লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। 'বোরকা'য় চক্ষু না থাকায় হীরা ঠিকমতো হাঁটিতে পারে না—সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল—কখনও হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।"[১]

দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র ৯ বৎসর—এতটুকু বালিকাকে 'অন্ধ বোরকা' পরিয়া পথ চলিতে হইবে। ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না!

[১৪]

প্রায় ২১।২২ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। আমার দূর-সম্পর্কীয়া এক মামি-শাশুড়ি ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন; সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা ছিল।

১. এখনই আষাঢ় মাসের মাসিক "মোহাম্মদী"তে শ্রীমতী আমিনা খাতুনের লিখিত প্রবন্ধের একস্থলে দেখিলাম,—কতক্ষণের জন্য নাক, মুখ, চোখ বন্ধ করিয়া বেড়ান (এইরূপ পর্দায় পরপুরুষের ঘাড়ে পড়া সম্ভবপর)—উহা ইসলামের বাহিরের পর্দা।"

কিউল স্টেশনে ট্রেন বদল করিতে হয়। মামানি সাহেব অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। স্টেশনে সে সময় মামানির চাকরানি ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরানি দোহাই দিয়া নিষেধ করিল—"খবরদার! কেহ বিবিসাহেবার গায়ে হাত দিও না।" সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল!

ট্রেনের সংঘর্ষে মামানি সাহেব পিষিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন,—কোথায় তাঁহার 'বোরকা'—আর কোথায় তিনি! স্টেশন-ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষক ব্যাপার দেখিল,—কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল; তাঁহার চাকরানি প্রাণপণে বিনাইয়া কাঁদিল আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় ১১ (এগারো) ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন! কী ভীষণ মৃত্যু!

[১৫]

হুগলিতে এক বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে এক কামরায় অনেক বিবি জড়ো হইয়াছেন। রাত্রি ১২টার সময় বোধ হইল, কেহ বাহির হইতে কামরার দরজা ঠেলিতেছে, জোরে, আস্তে—নানা প্রকারে দরজা ঠেলিতেছে। বিবিরা সকলে জাগিয়া উঠিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিলেন—নিশ্চয় চোর দ্বার ভাঙিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। আর বিবিদের দেখিয়া ফেলিবে! তখন এক জাহাঁবাজ বিবি সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া ফেলিলেন, অবশিষ্ট পুঁটলি বাঁধিয়া চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। পরে বোরকা পরিয়া দ্বার খুলিলেন। দ্বারের বাহিরে ছিল—একটা কুকুরি! তাহার বাচ্চাদুটি ঘটনাবশত কামরার ভিতর ছিল, আর সে ছিল বাহিরে। বাচ্চার নিকট আসিবার জন্য সেই কুকুরি দরজা ঠেলিতেছিল।

[১৬]

বেহার শরিফের এক বড়লোক দার্জিলিং যাইতেছিলেন; তাঁহার সঙ্গে এক ডজন "মানব-বোঝা" (human-luggage) অর্থাৎ মাসি পিসি প্রভৃতি ৭ জন মহিলা এবং ৬ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের ৫ জন বালিকা। তাঁহারা যথাক্রমে ট্রেন ও স্টিমার বদল করিবার সময় সর্বত্রই পালকির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মণিহারী ঘাট, সক্রিগলি ঘাট ইত্যাদিতে পালকি ছিল। বিবিদের পালকিতে পুরিয়া স্টিমারের ডেকে রাখা হইত। আবার ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহাদিগকে পালকিসহ মালগাড়িতে দেওয়া হইত। কিন্তু ই. বি. রেলওয়ে লাইনে আর পালকি পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা ট্রেনের রিজার্ভ করা সেকেন্ড ক্লাসের গাড়িতে বসিতে বাধ্য হইলেন।

শিলিগুড়ি স্টেশনেও পালকি বেহারা পাওয়া গেল না। এত বড় বিপদ—বিবিরা দার্জিলিং-এর ট্রেনে উঠিবেন কী করিয়া? অতঃপর দুইটা চাদর চারিজন লোকে দুই দিকে ধরিল,—সেই চাদরের বেড়ার মধ্যে বিবিরা চলিলেন। হতভাগা পরদাধারী চাকরেরা ঠিক তাল রাখিয়া পার্বত্য বন্ধুর পথে হাঁটিতে পারিতেছিল না। কখনও ডাইনের পরদা আগে যায়, বামের পরদা পিছনে থাকে; কখনও বামের পরদা অগ্রসর হয়, আর ডাইনের পরদা পশ্চাতে। বেচারি বিবিরা হাঁটিতে আরও অপটু—তাঁহারা পরদা ছাড়িয়া কখন আগে যান, কখনও পিছে রহিয়া যান! কাহারও জুতা খসিয়া রহিয়া গেল—কাহারও দোপাট্টা উড়িয়া গেল।

[১৭]

প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে আমাদের স্কুলে একজন লক্ষ্ণৌ নিবাসী শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, নাম আখতরজাহাঁ। তাঁহার তিনটি কন্যাও এই স্কুলে পড়িত। একদিন তিনি একালের মেয়েদের নির্লজ্জতার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের মেয়েদের বেহায়াপনার কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় নিজের বধূ-জীবনের একটা গল্প বলিলেন—"এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ি গিয়া তাঁহাকে এক নির্জন কক্ষে থাকিতে হইত। তাঁহার এক ছোট ননদ দিনে তিন-চারি বার আসিয়া তাঁহাকে প্রয়োজনমতো বাথরুমে পৌছাইয়া দিত। একদিন কী কারণে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সংবাদ লয় নাই। এদিকে বেচারি প্রকৃতির তাড়নায় অধীর হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্ণৌ-এ মেয়েকে বড় বড় তামার পানদান যৌতুক দেওয়া হয়। তাঁহার মস্ত পানদানটা সেই কক্ষেই ছিল। তিনি পানদান খুলিয়া সুপারির ডিবেটা বাহির করিয়া সুপারিগুলি একটা রুমালে ঢালিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি সেই ডিবেটা যে জিনিস দ্বারা পূর্ণ করিয়া খাটের নিচে রাখিলেন, তাহা লিখিতব্য নহে। সন্ধ্যার সময় তাঁহার পিত্রালয়ের চাকরানি বিছানা ঝাড়িতে আসিলে তিনি তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ডিবের দুর্দশার কথা বলিলেন। সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "থাক, তুমি কেঁদো না; আমি কালই ডিবেটা কালাই (Tinning) করাইয়া আনিয়া দিব। সুপারি এখন রুমালেই বাঁধা থাকুক।"

[১৮]

লাহোরের জনৈক ভুক্তভোগী ডাক্তার সাহেবের রোগিণী দর্শনের বর্ণনা এই—

সচরাচর ডাক্তার আসিলে দুইজন চাকরানি রোগিণীর পালঙ্কের শিয়রে ও পায়ের দিকে একটা মোটা বড় দোলাই ধরিয়া দাঁড়ায়; ডাক্তার সেই দোলাইয়ের একটু ফাঁকের ভিতর হাত দিয়া রোগিণীর নাড়ি পরীক্ষা করেন।[২]

২. আমাকে জনৈক নন-পরদা মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : (লেডি ডাক্তারের অভাবে পুরুষ) ডাক্তারকে জিহ্বা দেখাইতে হইলে আপনি কী করিবেন? দোলাই ফুটা করিয়া তাহার ভিতর হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া দেখাইবেন নাকি।

এক বেগমসাহেবা নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। আমি বলিলাম, ফেফড়ার অবস্থা দেখা দরকার; আমি পিঠের দিক হইতে দেখিয়া লইব। হুকুম হইল, "স্টেথিসকোপের নল, যেখানে বলেন, চাকরানি রাখিয়া দিবে!" সকলেই জানেন, ফেফড়া বিভিন্ন স্থান হইতে পরীক্ষা করিলে পর রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমি অগত্যা কর্তার হুকুমে রাজি হইলাম। চাকরানি নলটা দোলাইয়ের ভিতরে বেগম সাহেবের কোমরে নেফার (পায়জামার উপরাংশের) কিছু উপরে রাখিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আশ্চর্য হইলাম যে কোনো শব্দ শুনিতে পাই না কেন? দুঃসাহসে ভর দিয়া দোলাই একটু উঠাইয়া দেখিলাম,—দেখি কী নলটা কোমরে লাগানো হইয়াছে! আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।[৩]

[১৯]

জনৈক রেলপথে ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তের সারাংশ এই—স্টেশনে টিকিট কেটে মনে মনে একটা হিসাব করলাম। তিনখানা ইন্টার ক্লাসের টিকিটের দরুন দেড় মণ জিনিস নিতে পারব, কিন্তু আমাদের জিনিসপত্তর ওজন করলে পাঁচ মণের কম কিছুতেই হবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে লাগেজ না করাই ঠিক করলাম। মেয়েদের গাড়িতে জিনিস-পত্তর তুলে দিলে আর কে চেক করতে আসবে?

*　　*　　*

খোকা জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার সঙ্গে কোনো জ্যান্ত লাগেজ আছে নাকি?

আবার আছে নাকি! একেবারে একজোড়া! একে বুড়ি, তায় আবার থুড়থুড়ি।

খোকা বল্লে—তবেই সেরেছে!

*　　*　　*

যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, তখন বেশ রাত হয়েছে।

অনুমানে বুঝলাম, একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থেমে আছে। হঠাৎ মনে হ'ল, বহরমপুর হবে হয়তো। দরজাটা খুলে নামতে যাব, এমন সময় মনে হ'ল যেন শুনতে পেলাম, আমারই নাম ধরে কারা ডাকাডাকি করছে—'ও টুনু—টুনু, এ তো ভারি বিপদে আজ পড়লাম, টুনু রে!'

একে মেয়েলি গলা, তার ওপর আবার করুণ। আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। দেখলাম, দুই বুড়ি মাটিতে দাঁড়িয়ে মহা কান্নাকাটি শুরু করেছে, আর জিনিসপত্তরগুলোও সব নামানো হয়েছে। চারদিকে তিন-চার জন কুলি ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমি পাঠিকা ভগ্নীদিগকে ঐ প্রশ্নের এবং আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করি। ডাক্তারকে চোখ, দাঁত এবং কান দেখাইতে হইলে তাঁহারা কী উপায়ে দেখাইবেন?

৩. ডাক্তার সাহেবের নিজের ভাষায় শুনুন—'লা হাওলা বেলা কুওৎ! ময় দিক হো কর উঠ আয়া। আর নওয়াব সাহেব পুছতে হে' কে কেয়া পাতা লাগা? "ময় কেয়া থাক বাতাতা, কে কেয়া পাতা লাগা?"

আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। টি.টি.সি. অর্থাৎ চেকারগুলো রাত্রিবেলা মেয়েদের গাড়ি চেক ক'রে—মালপত্তর সব নামিয়ে দেবে এ তো কম অন্যায় কথা নয়। আমি কুলিগুলোকে খুব বকে দিলাম, জিনিসপত্তর আবার গাড়িতে তুলে দিতে বললাম। আর একবার কুলিগুলোকে একচোট বকে দিলাম, এবং টি. টি.সি.দের নামে যে রিপোর্ট করতে হবে, সেরকমও অনেক কথা বললাম।"

ঠাকুরমা কেঁদে বল্লেন, "আরে টুনু, আমরা যে এসে পড়েছি।"

অবশেষে একটা কুলি সাহস করে বল্লে, বাবু ঘাট আ গিয়া।

আমি ঠাকুরমাকে বল্লাম,—তা হলে টি.টি.সি. চেক্ করে নামিয়ে দেয়নি—ঘাটে এসে পড়েছ; সে কথা আমাকে আগে বললেই হ'ত, এজন্য কান্নাকাটি কেন?

[২০]

জনৈক পাঞ্জাবি বেগমসাহেবা নিম্নলিখিত গল্প কোনো উর্দু কাগজে লিখিয়াছেন—

আমরা একটা গ্রামে কিছুকাল ছিলাম। একবার তত্রত্য কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়া কুমারী মেয়েদের প্রতি যে অত্যধিক জুলুম হইতে দেখিলাম, তাহাতে আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম।

আমরা যথাসময় তথায় পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ির মেয়েরা কোথায়? শুনিতে পাইলাম, তাহারা সকলে রান্নাঘরে বসিয়া আছে। আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, কেবল একা আমাকে সেইখানে ডাকিয়া লওয়া হইল। রান্নাঘরে ভয়ানক গরম আর স্থানও অতিশয় অল্প। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া সেইখানে বসিয়া সেই 'মজলুম' কিন্তু মিষ্টভাষিণী বালিকাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম।

একজন দয়াবতী বিবি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "তোমরা সাবধানে লুকাইয়া উপরে চলিয়া যাও।"

আমি মনে করিলাম, সম্ভবত পুরুষমানুষদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই সাবধানে লুকাইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু পরে জানিলাম, এ পরদা সাধারণ অভ্যাগতা মহিলাদের বিরুদ্ধে ছিল। উক্ত বিবিসাহেবার হুকুমে দুইজন মেয়েমানুষ মোটা চাদর ধরিয়া পরদা করিল, আমরা সেই চাদরের অন্তরাল হইতে উপরে চলিয়া গেলাম।

উপরে গিয়া আমি আরও বিপদে পড়িলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, ছাদের উপর আরামে বসিবার কোনো কামরা হইবে, অথবা কমপক্ষে বর্ষাতি চালা হইবে। কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না। একে তো প্রখর রৌদ্র, দ্বিতীয়ত বসিবারও কিছু ছিল না। সমস্ত ছাদ জুড়িয়া অর্ধশুষ্ক ঘুঁটে ছড়ানো ছিল; তাহার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। বহু কষ্টে একজন চাকরানি একটা খাটিয়া আনিয়া দিল, আমরা অগত্যা তাহাতেই বসিলাম। নিচে বাজনা বাজিতেছিল; উৎসব হইতেছিল। কিন্তু অভাগিনী অনূঢ়া বালিকা কয়টি অপরাধিনীর ন্যায় রৌদ্রে বসিয়া ঘুঁটের দুর্গন্ধে হাঁপাইতেছিল। কেহই ইহাদের আরামের জন্য একটুকু খেয়াল করিতেছিল না।

[২১]

বঙ্গদেশের কোনো জমিদারের বাড়ি পুণ্যাহের উৎসব উপলক্ষে নাচ গান হইতেছিল। নর্তকীরা বাহিরে যেখানে বিরাট শামিয়ানার নিচে নাচিতেছিল, সে স্থানটা বাড়ির দেউড়ির কামরা হইতে দেখা যাইত। কিন্তু বাড়ির কোনো বিবি সে দেউড়ির ঘরে যান নাই। নৃত্য দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য লইয়া বিবিরা ধরাধামে আসেন নাই।

জমিদার সাহেবের একটি তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। মেয়েটি দিব্যি গৌরাঙ্গী। তাহাকে আদর করিয়া কেহ বলিত চিনির পুতুল, কেহ বলিত ননীর পুতুল। নাম সাবেরা। ভোরের সময় রৌশনচৌকির ভৈরবী আলাপে নিদ্রিত পাখিরা জাগিয়া কলরব আরম্ভ করিয়াছে। সাবেরার 'খেলাইও' (আধুনিক ভাষায় 'আয়া') জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার সাধ হইল, একটু নাচ দেখিতে যাইবে। কিন্তু সাবেরা তখনও ঘুমাইতেছিল। সুতরাং খেলাই সে নিদ্রিতা শিশুকে কোলে লইয়া দেউড়ির ঘরে নাচ দেখিতে গেল।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়। কর্তা সেই সময় বহির্বাটি হইতে অন্তঃপুরে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সাবেরাকে কোলে লইয়া খেলাই খড়খড়ির পাখি তুলিয়া তামাশা দেখিতেছিল। তাঁহার হাতে একটা মোটা লাঠি ছিল, তিনি সেই লাঠি দিয়া খেলাইকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। খেলাইয়ের চিৎকারে বিবিরা দৌড়িয়া দেউড়ি ঘরে আসিলেন। এক লাঠি লাগিল সাবেরার উরুতে। তখন কর্তার ভ্রাতৃবধূ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ছোট সাহেব, করেন কী! করেন কী! মেয়ে মেরে ফেলবেন?" প্রহারবৃষ্টি তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। জমিদার সাহেব সক্রোধে কহিলেন, "হতভাগী নিজে নাচ দেখবি দ্যাখ না, কিন্তু আমার মেয়েকে দেখাতে আনলি কেন?"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশু তো খেলাইয়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল—সে বেচারি কিছুই দেখে নাই। বাড়িময় শোরগোল পড়িয়া গেল—সাবেরার দুধের মতো শাদা ধবধবে উরুতে লাঠির আঘাতে এক বিশ্রী কালো দাগ দেখিয়া কর্তাও মরমে মরিয়া গেলেন। এইরূপে লাঠির গুঁতায় আমাদের অবরোধ কারায় বন্দি করা হইয়াছে।

[২২]

শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফরমে ভরা সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোক ট্রেনের অপেক্ষায় পায়চারি করিতেছিলেন। কিছু দূরে আর একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার পার্শ্বে একগাদা বিছানা ইত্যাদি ছিল। পূর্বোক্ত ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ ক্লান্তি বোধ করায় উক্ত গাদার উপর বসিতে গেলেন। তিনি বসিবামাত্র বিছানা নড়িয়া উঠিল—তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেই দণ্ডায়মান ভদ্রলোক দৌড়িয়া

আসিয়া সক্রোধে বলিলেন—"মশায়, করেন কী? আপনি স্ত্রীলোকদের মাথার উপর বসিতে গেলেন কেন?" বেচারা হতভম্ব হইয়া বলিলেন, "মাফ করবেন মশায়! সন্ধ্যার আঁধারে ভালোমতো দেখিতে পাই নাই, তাই বিছানার গাদা মনে করিয়া বসিয়াছিলাম। বিছানা নড়িয়া উঠায় আমি ভয় পাইয়াছিলাম যে, এ কী ব্যাপার!"

[২৩]

অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবে মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পরদা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পরদা করিতে হইত। পুরুষদের তো অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়েমানুষের অবাধ গতি—অথচ তাহাদের দেখিতে-না-দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত ; অমনি বাড়ির কোনো লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণভয়ে যত্রতত্র—কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনও কোনো চাকরানির গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তপোশের নিচে লুকাইতাম।

বাচ্চাওয়ালি মুরগি যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নিচে পলায়, আমাকেও সেইরূপ পলাইতে হইত। কিন্তু মুরগির ছানার তো মায়ের বুকস্বরূপ একটা নির্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে পলাইয়া থাকে; আমার জন্য সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগির ছানা স্বভাবতই মায়ের ইঙ্গিত বুঝে—আমার তো সেরূপ কোনো স্বাভাবিক ধর্ম (instinct) ছিল না। তাই কোনো সময় চক্ষের ইশারা বুঝিতে না পারিয়া দৈবাৎ না পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরুব্বিগণ, "কলিকালের মেয়েরা কী বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ" ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।

আমার পঞ্চম বর্ষ বয়সে কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয়া ভ্রাতৃবধূর খালার বাড়ি—বোহার হইতে দুইজন চাকরানি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রি পাসপোর্ট' ছিল,—তাহারা সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়মান হরিণশিশুর মতো প্রাণ হাতে লইয়া যত্রতত্র—কপাটের অন্তরালে কিম্বা টেবিলের নিচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জন চিল-কোঠা ছিল; অতি প্রত্যুষে আমাকে খেলাই কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। বোহারের চাকরানিদ্বয় সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিল-কোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সহবয়সী ভগিনী-পুত্র, হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই ছাপরখাটের নিচে গিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম—ভয়, পাছে আমার নিশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়হীনা স্ত্রীলোকেরা খাটের নিচে উঁকি মারিয়া দেখে! সেখানে কতকগুলি বাক্স-পেটারা,

মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার (৬ বৎসর বয়সের) ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া সেইগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারিধার দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল। আমার খাওয়ার খোঁজখবরও কেহ নিয়মমতো লইত না। মাঝে মাঝে হালু খেলিতে খেলিতে চিল-কোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বলিতাম। সে কখনও এক গ্লাস পানি, কখনও খানিকটা 'বিন্নি' (খইবিশেষ) আনিয়া দিত। কখনওবা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না—ছেলেমানুষ তো, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারিদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

[২৪]

বেহার অঞ্চলে শরিফ ঘরানার মহিলাগণ রেলপথে ভ্রমণের পথে ট্রেনে উঠেন না। তাঁহাদিগকে বনাতের পরদা-ঢাকা পালকিতে পুরিয়া, সেই পালকি ট্রেনের মালগাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হয়। ফল কথা, বিবিরা পথের দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা ব্রুকবন্ড চায়ের মতো vacuum টিনে প্যাক হইয়া দেশভ্রমণ করেন। কিন্তু এই কলিকাতার এক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবার উহার ওপরও টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ির বিবিদের রেলপথে কোথাও যাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাদের প্রত্যেককে, পালকিতে বিছানা পাতিয়া, একটা তালপাতার হাতপাখা, এক কুজা পানি এবং একটা গ্লাস-সহ বন্ধ করা হয়। পরে সেই পালকিগুলি তাঁহাদের পিতা কিম্বা পুত্রের সম্মুখে চাকরেরা যথাক্রমে—(১) বনাতের পরদা দ্বারা প্যাক করে; (২) তাহার উপর মোম-জমা কাপড় দ্বারা সেলাই করে; (৩) তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে; (৪) তাহার পর বোম্বাই চাদরের দ্বারা সেলাই করে; (৫) অতঃপর সর্বোপরে চট মোড়াই করিয়া সেলাই করে। এই সেলাই ব্যাপার তিন-চারি ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়—আর সেই চারি ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়ির কর্তা ঠায় উপস্থিত থাকিয়া খাড়া পাহারা দেন। পরে বেহারা ডাকিয়া পালকিগুলি ট্রেনের ব্রেকভ্যানে তুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পর, পুনরায় পুরুষ অভিভাবকের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে পালকিগুলির সেলাই খোলা হয়। সেলাই খুলিয়া পালকিগুলি বনাতের পর্দা ঢাকা অবস্থায় রাখিয়া চাকরেরা সরিয়া যায়। পরে কর্তা স্বয়ং এবং বাড়ির অপর আত্মীয় এবং মেয়েমানুষেরা আসিয়া পালকির কপাট খুলিয়া মুমূর্ষা বন্দিনীদের অজ্ঞান অবস্থায় বাহির করিয়া যথারীতি মাথায় গোলাপ জল ও বরফ দিয়া, মুখে চামচ দিয়া পানি দিয়া, চোখে মুখে পানির ছিটা দিয়া বাতাস করিতে থাকেন। দুই ঘণ্টা বা ততোধিক সময়ের শুশ্রূষার পর বিবিরা সুস্থ হন।

[২৫]

"অবরোধ-বাসিনী'র ১১নং প্যারায় লিখিয়াছি যে, আমি গত ১৯২৪ সালে আমার দুই নাতিনের বিবাহোপলক্ষে আরায় গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আরা শহরটার সেই বাড়িখানা এবং আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমার 'মেয়েকে'

(অর্থাৎ মেয়ের মৃত্যুর পর জামাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে) সেই কথা বলায় তিনি অতি মিনতি করিয়া আমাকে বলিলেন, "আম্মা, আপনি যদি দয়া করিয়া শহর দেখিতে চান, তবে আমরাও আপনার জুতার বরকতে শহরটা একটু দেখিয়া লইব। আমরা সাত বৎসর হইতে এখানে আছি, কিন্তু শহরের কিছুই দেখি নাই।" সদ্যপরিণীতা মজু এবং সবুও সকাতরে বলিল, "হ্যাঁ নানিআম্মা, আপনি আব্বাকে বলিলেই হইবে।"

আমি ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন বাবাজীবনকে একখানা গাড়ি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলায়, তিনি প্রতিদিনই অতি বিনীতভাবে জানাইতেন যে, গাড়ি পাওয়া যায় না। শেষের দিন বিকালে তাঁহার ১১ বৎসর বয়স্ক পুত্র আমাদের সংবাদ দিল যে, যদি-বা একটা ভাড়াটে গাড়ি আসিয়াছে, কিন্তু তাহার জানালার একটা পাখি ভাঙা। মজু অতি আগ্রহের সহিত বলিল, "সেখানটায় আমরা পরদা করিয়া লইব—আল্লার ওয়াস্তে তুমি গাড়ি ফেরত দিও না।" সবু ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, "ভালোই হইয়াছে, ঐ ভাঙা জানালা দিয়া ভালোমতো দেখা যাইবে।" আমরা যতবারই গাড়িতে উঠিতে যাইবার জন্য তাড়া দিই, ততবারই শুনি : সবুর করুন, বাহিরে এখনও পরদা হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে গাড়িতে গিয়া দেখি, সোবহান আল্লাহ্! দুই-তিন খানা বোম্বাইয়ে চাদর দিয়া গাড়িটা সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। জামাতা স্বয়ং গাড়ির দরজা খুলিয়া দিলেন, আমরা গাড়িতে উঠিবার পর তিনি স্বহস্তে কাপড় দিয়া দরজা বাঁধিয়া দিলেন। গাড়ি কিছু দূরে গেলে, মজু সবুকে বলিল, "দেখ এখন ভাঙা জানালা দিয়া!" সেই পরদার এক স্থলে একটা ছিদ্র ছিল, মজু, সবু এবং তাহাদের মাতা সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, আমি আর সে ফুটা দিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের সহিত কাড়াকাড়ি করিলাম না।

[২৬]

আমাদের ন্যায় আমাদের নামগুলি পর্যন্ত পর্দানশিনা। মেয়েদের নাম জানা যায়, কেবল তাহাদের বিবাহের কাবিন লিখিবার সময়। এক মস্ত জমিদারের তিন কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে হইতেছিল। মেয়েদের ডাকনাম, বড় গেন্দলা, মেজো গেন্দলা এবং ছোট গেন্দলা—প্রকৃত নাম কেহই জানে না। তাহাদের সম্পর্কের এক চাচা হইলেন বিবাহ পড়াইবার মোল্লা। কন্যাদের বয়স অনুসারে তিনজন বরের বয়সেরও তারতম্য ছিল। তিনজন বরই বিবাহকেন্দ্রে অনুপস্থিত। আমরা পাঠিকাদের সুবিধার নিমিত্ত বরদিগকে বয়স অনুসারে ১নং, ২নং এবং ৩নং বলিব।

মোল্লা সাহেবের হাতে তিন বর এবং তিন কন্যার নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তিনি যথাসময়ে বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া ভ্রমবশত বর ও কন্যাদের নাম গোলমাল করিয়া ১নং বরের সহিত ছোট গেন্দলার বিবাহ দিয়া দিলেন; ৩নং বরের সহিত মেজো গেন্দলার বিবাহ দিলেন। এখন ২নং বরের

সহিত বড় গেন্দলার বিবাহের পালা। মেজো ও ছোট গেন্দলার বয়স খুব অল্প—১১ এবং ৭ বৎসর, তাই তাহারা কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু বড় গেন্দলার বয়স ১৯ বৎসর; সে লুকাইয়া ছাপাইয়া মুরুব্বিদের কথাবার্তা শুনিয়া জানিয়াছিল, তাহার বিবাহ হইবে ১নং বরের সহিত। আর বরের নামও তাহার জানা ছিল। সুতরাং ২নং বরের নাম লইয়া মোল্লা সাহেব যখন বড় গেন্দলার 'এজেন' চাহিলেন, সে আর কিছুতেই মুখ খোলে না। মা, মাসির উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও যখন সে কিছু বলিল না, তখন তাহার মাতা আর ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া মোল্লা সাহেবকে বলিলেন, "হ্যাঁ গেন্দলা 'হু' বলেছে; বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি আর কতকক্ষণ হয়রান হবে।" তিনি বলিলেন, "আমরা গেন্দলার মুখের 'হু' শুনি নাই, তবে কি আপনার 'হু' লইয়া আপনারই বিবাহ পড়াইব নাকি?" তদুত্তরে ক'নের মা তাঁহার পিঠে এক বিরাট কিল বসাইয়া দিলেন। অবশেষে গেন্দলা বেচারি 'হু' বলিল কি না, আমরা সে খবর রাখি না।

এদিকে যথাসময় টেলিগ্রাফযোগে ৩০ বৎসর বয়স্ক ১নং বর যখন জানিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে (১৯ বৎসর বয়স্কা বড় গেন্দলার পরিবর্তে) সর্বকনিষ্ঠা ৭মবর্ষীয়া ছোট গেন্দলার সহিত, তখন তিনি চটিয়া লাল হইলেন,—শাশুড়িকে লিখিলেন কন্যা বদল করিয়া দিতে; নচেৎ তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে জুয়াচুরির মোকদ্দমা আনিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

[২৭]

প্রায় ১০।১১ বৎসরের ঘটনা। বলিয়াছি তো বেহার অঞ্চলে বিবাহের তিন মাস পূর্বে 'মাইয়াখানায়' বন্দি করিয়া মেয়েদের আধমরা করা হয়; ও কখনও ঐ বন্দিশালায় বসিবার মেয়াদ,—যদি বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা হইয়া বিবাহের তারিখ পিছাইয়া যায় তবে বৎসর কালও হয়। এক বেচারি সেইরূপ ছয় মাস পর্যন্ত বন্দিনী ছিল। তাহার স্নান, আহার প্রভৃতির বিষয়েও যথাবিধি যত্ন লওয়া হইত না। একেই তো বিহারি লোকেরা সহজে স্নান করিতে চায় না, তাহাতে আবার 'মাইয়াখানার' বন্দিনী মেয়েকে কে ঘন ঘন স্নান করাইবে? ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না—প্রয়োজনমতো তাহাকে কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন মাথা গুঁজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়, রাত্রিকালে সেখানেই শুইতে হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়, অপরে 'অবখোরা' ধরিয়া পানি খাওয়াইয়া দেয়। মাথার চুলে জটা হয়, হউক—সে নিজে মাথা আঁচড়াইতে পারিবে না। ফল কথা, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাহাকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যাহা হউক, ছয় মাস অন্তর সেই মেয়েটির বিবাহ হইলে দেখা গেল, সর্বদা চক্ষু বুজিয়া থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটি চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

[২৮]

বহুকালের ঘটনা। বহু পুণ্যফলে আরবদেশীয় কোনো মহিলা কলিকাতায় তশরিফ আনিয়াছিলেন। তিনি ভাঙা-ভাঙা উর্দু বলিতে শিখিয়াছিলেন। যখন দলে দলে বিবিরা পালকিযোগে তাঁহার জেয়ারত করিতে আসিতেন, তিনি পালকি দেখিয়া হয়রান হইতেন যে এ 'আজাব' কেন?

একদিন পূর্ববঙ্গের এক বিবি আসিয়াছিলেন। আরবীয়া মহিলা কুশল প্রশ্ন প্রসঙ্গে আগন্তুক বিবির স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরদানকালে বাঙ্গাল বিবি মাথার ঘোমটা টানেন আর বলেন, "তানি ত বালই আছেন। তানার আবার কী অইব? তানি ত বালই আছেন।" বেচারি আরবীয়া বিবি বুঝিতেই পারিলেন না যে, স্বামীর কুশল বলিবার সময় ঘোমটা টানার প্রয়োজন হইল কেন?

আরবীয়া বিবি বাঙ্গালার বিবিদের পালকিতে উঠার ব্যাপারটা কৌতুকের সহিত দাঁড়াইয়া দেখিতেন। একদিন এক বোরকা-পরিহিতা পালকিতে উঠিলেন, তাঁহার কোলে দুই বৎসরের শিশু, সঙ্গে পানদান, একটা বড় কাঠের বাক্স, একটা কাপড়ের গাঁঠরি এবং এক কুজা পানি। পালকিটার বেতের ছাউনি ভাঙা ছিল, তাহা পূর্বে কেহ লক্ষ করে নাই। বেহারাগণ যখন পালকি তুলিল, অমনি মড়মড় করিয়া পালকির বেত্রাসন ভাঙিতে লাগিল। পালকির দুইপার্শ্বে দুইজন বরকন্দাজ চলিয়াছে—তাহারা শিশুটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবজাদা, মড়মড় শব্দ করে কী?" কিন্তু পালকি হইতে কোনো উত্তর আসিল না।—একটু পরে গেট পার হইয়া পালকিটা অত্যন্ত হাল্‌কা বোধ হওয়ায় বেহারাগণ থমকিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে ভাঙা পালকি গলাইয়া বোরকা-পরা বিবি ছেলেকে আঁকড়িয়া ধরিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছেন; গাঁঠরি, পানদান সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কুজা ভাঙিয়া পানি পড়িয়া তিনি ভিজিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তবু মুখে বলেন নাই—"পালকি থামাও!" কলিকাতার রাস্তায় এই ব্যাপার!—বেচারি আরবের বিবি তাড়াতাড়ি চাকরানি পাঠাইয়া বিবিটিকে আনাইয়া বলিলেন, "বিবি, পালকির এমন তামাশা দেখিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না!"

[২৯]

একবার আমি কোনো একটি লেডিজ কনফারেন্স উপলক্ষে আলিগড়ে গিয়াছিলাম। সেখানে অভ্যাগতা মহিলাদের নানাবিধ বোরকা দেখিলাম। একজনের বোরকা কিছু অদ্ভুত ধরনের ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার বোরকার প্রশংসা করায় তিনি বলিলেন,—"আর বলিবেন না—এই বোরকা লইয়া আমার যত লাঞ্ছনা হইয়াছে!" পরে তিনি সেইসব লাঞ্ছনার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা এই :—

তিনি কোনো বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি শাদির নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে (বোরকা-সহ) দেখিবামাত্র সেখানকার ছেলেমেয়েরা ভয়ে চিৎকার করিয়া কে কোথায় পালাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরও কয়েক ঘর বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত

তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাঁহাকে সকলের বাড়িই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে বাড়ি গিয়াছেন, ততবারই ছেলেদের সভয় চিৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। ছেলেরা ভয়ে থরথর কাঁপিত।

তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি-পাঁচ জনে বোরকা-সহ খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, "ও মা! ওগুলো কী গো?" একে অপরকে বলে, "চুপ কর!—এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।" বাতাসে বোরকার নেকাব একটু-আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত—"দ্যাখ রে দ্যাখ! ভূতগুলার শুঁড় নড়ে! বাবা রে! পালা রে!"

তিনি একসময় দার্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম স্টেশনে পৌছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে—বামনটা উচ্চতায় একটা ৭।৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকের, মুখ-ভরা দাড়ি গোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে। দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোরকাধারিণীকে দেখিতে লাগিল!

অতঃপর দার্জিলিং পৌছিয়া তাঁহারা আহারান্তে বেড়াইতে বাহির হইলেন, অর্থাৎ রিক্‌শ গাড়িতে করিয়া যাইতেছিলেন। 'মেলে' গিয়া দেখিলেন, অনেক ভিড়; সেদিন তিব্বত হইতে সেনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য লোকের ভিড়। তাঁহার রিক্‌শখানি পথের একধারে রাখিয়া তাঁহার কুলিরাও গেল,—তামাশা দেখিতে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখেন, দর্শকেরা সকলেই এক-একবার রিক্‌শর ভিতর উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছে।

তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলা ঘেউঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত। দুই-একটা পার্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ার-সুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত। একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন-চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে![৪]

একবার তাঁহার পরিচিতা আরও চারি-পাঁচজন বিবির সহিত বেড়াইবার সময় একটা ক্ষুদ্র ঝরনার ধারে কঙ্করবিশিষ্ট কাদায় সকলেই বোরকায় জড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। নিকটবর্তী চা-বাগান হইতে কুলিরা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের তুলিল; আর স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনায় বলিল, "একে তো জুত্তা পরেছ, তার ওপর আবার ঘেরাটোপ,—এ অবস্থায় তোমরা গড়াইবে না তো কী করিবে?" আহা! বিবিদের কারচুবি কাজ করা দো-পাট্টা কাদায় লতড়-পতড়, আর বোরকা ভিজিয়া তর-বতর!

কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিত,—"চুপ কর, ঐ দ্যাখ মক্কা মদিনা যায়,—ঐ!—ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ি,—ওরাই মক্কা মদিনা!!"

৪. বাঙালি ও গুর্খায় প্রভেদ দেখুন; যৎকালে বাঙালি ছেলেরা ভয়ে চিৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া পলাইত, সে-সময় গুর্খাশিশু আত্মরক্ষার জন্য ঢিল তুলিয়াছে সে ভয়াবহ বস্তুকে মারিতে।

[৩০]

কোনো একটি কুলে শীলে ধন্য সৎপাত্রের সহিত এক জমিদারের বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল। কী কারণে, বরের পিতার সহিত কন্যাকর্তার ঝগড়া হওয়ায় বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। ইহাতে পাত্রী যারপরনাই দুঃখিতা হইল।

কন্যার পিতা তাড়াতাড়ি অন্য বর না পাইয়া নিজের এক দুরাচার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বসিলেন। সে বেচারি তাহার খুড়তাতো ভাইয়ের কুকীর্তির বিষয় সমস্তই অবগত ছিল,—কত দিন সে নিজেই ঐ মাতালটাকে তেঁতুলের শরবত খাওয়াইয়া এবং মাথায় জল ঢালিয়া তাহার মাতলামি দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং এই বিবাহে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল।

কিন্তু পাত্রী তো মূক,—তাহার বাক্‌শক্তি থাকিয়াও নাই। তাহার একমাত্র সম্বল নীরব রোদন। তাই সে কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতামাতার ভ্রূক্ষেপ নাই—তাঁহারা ঐ মাতালের সহিত তাহার বিবাহ দিবেনই দিবেন। এইরূপেই আমাদের কাঠমোল্লা শ্রেণীর মুরুব্বিগণ শরিয়তের গলা টিপিয়া মারিয়া ইসলাম ও শরিয়ত রক্ষা করিতেছেন।

বিবাহ-সভায় বসিয়া পাত্রী কিছুতেই 'হু' বলিতেছিল না। মাতা, পিতামহী প্রভৃতির অনুনয়, সাধ্য-সাধনা, মিষ্ট ভর্ৎসনা,—সবই সে দুই চক্ষের জলে ভাসাইয়া দিতেছিল। অবশেষে একজনে অতর্কিতে কন্যাকে খুব জোরে চিমটি কাটিল; সেই আঘাতে সহসা "উহু!" বলিয়া সে কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই "উহু" কে "হু" বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। সোবহান আল্লাহ্! জয়, অবরোধের জয়!

[৩১]

একবার কোনো স্থলে চলন্ত ট্রেনে মেয়েমানুষদের কক্ষে একটা চোর উঠিল। চোর বহাল-তবিয়তে একে একে প্রত্যেকের অলঙ্কার খুলিয়া লইল; কিন্তু লজ্জায় জড়সড় লজ্জাবতী অবলা সরলা কুলবালাগণ কোনো বাধা দিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রমাগত ঘোমটা টানিতে থাকিলেন। "তওবা! তওবা! কাহাঁ সে মর্দূয়া আ গয়া!" বলিয়া কেহ কেহ বোরকার নেকাব টানিলেন। পরে চোর মহাশয় ট্রেনের এলার্মের শিকল টানিয়া গাড়ি থামাইয়া নির্বিঘ্নে নামিয়া গেল।

[৩২]

ভাংনীর জমিদার সাহেবের ডাকনাম—ধরুন—বাচ্চা মিয়া। তাঁহার পত্নীর নাম হাসিনা খাতুন। হাসিনার পিতার বিশাল সম্পত্তি,—অগাধ টাকা। একবার বাচ্চা মিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আমার টাকার দরকার, আজই তোমার পিতার নিকট পত্র

লিখাইয়া টাকা আনাইয়া দাও।" যথাসময়ে টাকার পরিবর্তে তথা হইতে মিতব্যয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতার ন্যায় পত্র আসিল।

বাচ্চা মিয়ার শ্বশুর অনেকবার জামাতাকে টাকা দিয়াছেন। এখন টাকা দানে তাঁহার অরুচি জন্মিয়া গিয়াছে। তাই কন্যাকে টাকা না পাঠাইয়া উপদেশ পাঠাইলেন। ইহাতে বাচ্চা মিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীর 'নাইওর' (পিত্রালয়) যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

একদিকে পিতামাতা কাঁদেন, অপরদিকে হাসিনা নীরবে কাঁদেন—পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ আর হয় না। কিছুকাল পরে হাসিনার ভ্রাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন।

তিনি সোজা ভাংনী না গিয়া পথে দুই ক্রোশ দূরে ফুলচৌকী নামক গ্রামে তাঁহার মাসিমার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ভাংনীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি অপরাহ্ণে তথায় যাইবেন।

যাহাতে ভ্রাতা ও ভগিনীতে দেখা না হইতে পারে, সেজন্য বাচ্চা মিয়া এক ফন্দি করিলেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য ফুলচৌকী হইতে লোক আসিয়াছে। হাসিনা স্বামীর চালবাজি জানিতেন, সহসা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি কোনো প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অদ্য অপরাহ্ণে তাঁহার ভাইসা'ব আসিবেন।

বাচ্চা মিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভাইসা'বের মাথা ধরিয়াছে, তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। সেইজন্য খালাআম্মা ইয়ার মাহমুদ সর্দারকে পাঠাইয়াছেন আমাদের লইয়া যাইতে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস না কর তো চলো দেউড়িঘরে গিয়া স্বকর্ণে সর্দারের কথা শুন।"

তদনুসারে দেউড়িঘরের দ্বারের বাহিরে ইয়ার মাহমুদকে ডাকিয়া আনা হইল। ঘরের ভিতর হইতে বাচ্চা মিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ার মাহমুদ! তুমি এখন ফুলচৌকী হইতে আইস নাই?" সে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, হুজুর! আমিই খবর নিয়া আসিয়াছি—" বাচ্চা মিয়া তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া তাহাকে আর বেশিকিছু বলিতে দিলেন না।

হাসিনা হাসিখুশি; মাসিমার বাড়ি যাইতে প্রস্তুত হইলেন! তাঁহার জন্য বানাতের ঘেরাটোপ-ঢাকা পালকি সাজিল, তাঁহার বাঁদিদের জন্য খেরুয়ার ওয়াড়-ঘেরা গোটা আষ্টেক ডুলি সাজিল, বাচ্চা মিয়ার মেয়ানা (খোলা পালকি বিশেষ) সাজিল। আর্দালি, বরকন্দাজ, আসাবরদার, সোটাবরদার ইত্যাদিসহ তাঁহারা বেলা ১টার সময় রওনা হইলেন।

পথে যখন হাসিনা বুঝিতে পারিলেন যে, দুইখানি ডিঙ্গি নৌকা জুড়িয়া তার উপর তাঁহার পালকি রাখিয়া নদী পার করা হইতেছে, তখন তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন যে, ফুলচৌকী যাইতে তো নদী পার হইতে হয় না—আল্লা রে, আল্লাহ্! সা'ব তাঁহাকে এ কোন জায়গায় আনিলেন!! পালকিতে মাথা ঠুকিয়া কান্না ছাড়া অবরোধ-বাসিনী আর কী করিতে পারে?

[৩৩]

প্রায় ১৮ বৎসর হইল, কলিকাতায় একটা দেড় বৎসর বয়স্ক শিশুর জ্বর হইয়াছিল। তাঁহাদের অবরোধ অতি কঠোর—তাই অতটুকু মেয়েকেও কোনো হি-ডাক্তার দেখিতে পাইবেন না, সুতরাং শি-ডাক্তার আসিয়াছেন। বাড়ি ভরা যে স্ত্রীলোকেরা আছেন, তাঁহাদের একমাত্র 'শরাফত' ব্যতীত আর কোনো গুণ নাই। তাঁহারা লেডি ডাক্তার মিস গুপ্তকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মিস গুপ্ত দেখিয়া শুনিয়া রোগী-মেয়েকে গরম জলে স্নান করাইতে চাহিলেন।

শি-ডাক্তার মিস গুপ্ত চাহেন গরম জল—বিবিরা দেখেন একে অপরের মুখ! তিনি চাহেন ঠাণ্ডা জল—বিবিরা বলেন, "বাপ্ রে! ঠাণ্ডা জলে স্নান করালে মেয়ের জ্বর বেড়ে যাবে!" ফল কথা, বেচারি মিস গুপ্ত সেদিন কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিজের বক্তব্য বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া কর্তার নায়েব সাহেবকে সমস্ত বলিয়া বিদায় হইবার সময় বলিলেন, তিনি এ বাড়িতে আর আসিবেন না। নায়েব সাহেব অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে ১৬৲ ফি গছাইয়া দিয়া পরদিন আবার আসিতে বলিলেন।

পরদিন আবার শি-ডাক্তার মিস গুপ্তকে লইয়া বাড়ির গিন্নিদের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। বে-গতিক দেখিয়া নায়েব সাহেব তাঁহার পরিচিতা জনৈকা মহিলাকে আনিয়া মিস গুপ্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বীণাপাণি (নায়েব সাহেবের প্রেরিতা সেই বাঙালি মহিলা) আসিয়া দেখেন, লেডি ডাক্তার রাগিয়া ভূত হইয়া আছেন। আর সমবেত বিবিরা দাঁড়াইয়া ভয়ে থরথর কাঁপিতেছেন—তাঁহাদের মুখে ধান দিলে খই ফোটে। শেষে মিস গুপ্ত গর্জন করিয়া বলিলেন, "ময়ঁ তামাসা দেখ্নে নেহী আয়ী হোঁ!"

বীণাপাণি চুপি চুপি বিবিদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কী? তাঁহারা বলিলেন, বুঝিতে পারি না,—তিনি তোয়ালে চাহেন, টব চাহেন, কিন্তু আমরা যাহা দেই, তাহাই দূরে ছুড়িয়া ফেলেন।

পরে তিনি মিস গুপ্তকে তাঁহার বিরক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি! আধঘণ্টার ওপর হয়ে এল, এখন পর্যন্ত মেয়েকে স্নান করাবার জন্য কোনো জিনিস পেলুম না।" বীণা সভয়ে বলিলেন, "উহারা যে জিনিস দেন, তাই নাকি আপনি পছন্দ করেন না?"

মিস গুপ্ত বলিলেন, "কী করে পছন্দ করব বলুন দেখি? আমি চাই একটা বাথ-টাব, তাতে বসিয়ে শিশুকে স্নান করাব, ওঁরা দেন আমাকে এতটুকু একটা একসেরা ডেকচি—কাজেই আমি ছুড়ে ফেলেছি! আপনি বলুন, এতটুকু ডেকচির ভিতর আমি শিশুকে বসাই কী ক'রে? আমি চাই নরম পুরাতন কাপড়, শিশুর গা মুছে দেবার জন্য, ওঁরা দেন আমাকে নূতন খসখসে তোয়ালে,—কাজেই আমি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি! আমাকে ঐশ্বর্য দেখান যে, নূতন তোয়ালে আছে! এঁরা মনে করেন যে, এঁরা পীর—তাই everybody should worship them!

শেষে বীণা সমস্ত জিনিস জোগাড় করিয়া দিয়া শিশুকে স্নান করাইতে মিস গুপ্তের সাহায্য করিলেন। তখন রাগ পড়িয়া গিয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল, বিবিরাও নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

[৩৪]

শুনিয়াছি বঙ্গদেশের কোনো শরিফ খান্দানের বাড়ির নিয়ম এই যে, বিবাহের সময় কন্যাকে 'হুঁ' বলিয়া এজেন দিতে হয় না। মেয়ের কণ্ঠস্বরের ঐ 'হুঁ'টুকুই বা পর-পুরুষে শুনিবে কেন? সেইজন্য বিবাহ-সভায় মোটা পরদার একদিকে পাত্রীর উকিল, সাক্ষী, আত্মীয়স্বজন এবং বর-পক্ষের লোকেরা থাকে, অপরপার্শ্বে কন্যাকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা বসে। পরদার নিচে একটা কাঁসার থালা থাকে,—থালার অর্ধেক পর্দার এপারে, অপর অর্ধাংশ পরদার ওপারে থাকে।

বিবাহের কলেমা পড়ার পর কন্যার কোনো সঙ্গিনী বা চাকরানি একটা সরোতা (যাঁতি) সেই থালার উপর ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দেয়—যাঁতিটা সশব্দে পুরুষের দিকে গিয়া পড়িলে বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়িল। লক্ষ্ণৌ-এর এক বিবির সহিত আমার আলাপ আছে। একদিন তাঁহার বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছি; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সপ্তমবর্ষীয় পুত্র দুষ্টামি করায় তিনি তাহাকে "হারামি—" বলিয়া গালি দিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ছেলে পলাইয়া গেলে পর আমি তাঁহাকে বিনা-সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গালি তিনি কাহাকে দিলেন,—ছেলেকে, না ছেলের মাতাকে? তিনি তদুত্তরে সহাস্যে বলিলেন যে, বিবাহের সময় যদিও তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা ছিলেন তথাপি কেহ তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করে নাই। বিবাহ মজলিসে তিনি 'হুঁ' 'হাঁ' কিছুই বলেন নাই; জবরদস্তি তাঁহার শাদি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার "সব বাচ্চে হারামজাদে!"

[৩৫]

মরহুম মৌলবী নজীর আহমদ খাঁ বাহাদুরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত দিল্লি গদরের সময় অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের দুর্দশার বর্ণনা হইতে অংশবিশেষের অনুবাদ এই :

রাত্রি ১০টার সময় আমার ভাইজানকে কাপ্তেন সাহেবের প্রেরিত লোকটি বলিল যে, আমরা রাত্রি ২টার সময় বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিব। আপনাদের বাড়ির নিকটেই তোপ লাগানো হইয়াছে। অতএব, আপনারা আক্রমণের পূর্বেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন। এ সংবাদ শুনিবামাত্র আমাদের আত্মা শুকাইয়া গেল! কিন্তু কোনো উপায় ছিল না!

শেষে আমরা পদব্রজে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলাম। সেদিনের দুঃখের কথা মনে হইলে এখনও মনে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। এক কর্ত্রীসাহেবা সমস্ত

ধনদৌলত ছাড়িয়া পানদান সঙ্গে লইয়া চলিলেন। হতভাগীদের মোটেই হাঁটিবার অভ্যাস নাই—এখন প্রাণের দায়ে হাঁটিতে গিয়া কাহারও জুতা খসিয়া রহিয়া গেল, কাহারও ইজারবন্দ পায়ে জড়াইয়া গেল; সেদিন যাঁর পায়জামার পাঁয়চা যত বড় ছিল, তাঁহারই হাঁটিতে তত অধিক কষ্ট হইতেছিল। ভাইজান সে সময় তিক্তবিরক্ত হইয়া তাঁহাদের বলিতেছিলেন, "কমবখতিরা আরও দুই থান নয়নসুখের পায়জামা বানাও। লাহোরের রেশমি ইজারবন্দ আরও জরির ঝালর লাগাইয়া লম্বা করো!"

বেচারারা বাজারের পথে চলিলেন; ভাগ্যে রাত্রি ছিল, তাই রক্ষা! অর্থাৎ আমাদের তৎকালীন দুর্গতি দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হয় নাই। আহা রে। সকলের পা ফুলিয়া ভারী হইল যেন এক এক মণ,—দুই পা চলেন আর হোঁচট খান, বারবার পড়েন। একজন পথে বসিয়া একেবারে এলাইয়া পড়িলেন যে, আর তিনি হাঁটিতে পারিবেন না। কেবল পায়ে ব্যথা নয়, আমাদের সর্বাঙ্গে বেদনা হইয়া গেল। বেচারি বিবিদের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না।

কিছুদূর যাইয়া দেখি, হাজার হাজার গোরা আর শিখসৈন্য সারি বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। আরও চলশ্ছক্তিবিহীন হইয়া পড়িলাম।

অবশেষে বহু কষ্টে কিছুদূর গিয়া ভাইজান চারটা গাধা সংগ্রহ করিলেন। শেষে গাধায় উঠিয়া বিবিরা রক্ষা পাইলেন।

[৩৬]

শীতকাল। মাঘ মাসের শীত। সেই সময় কোথা হইতে এক ভালুকের নাচওয়ালা গ্রামে আসিল। গ্রামে কোনো নূতন কিছু আসিলে প্রথমে তাহাকে জমিদারবাড়িতে হাজিরা দিতে হয়। তদনুসারে ভালুকওয়ালা জমিদারবাড়িতেই অতিথি হইয়াছে। প্রশস্ত দালানের উত্তর দিকের মাঠে প্রত্যহ ভালুকের নাচ হয়,—গ্রামসুদ্ধ লোকে আসিয়া নাচ দেখে। কিন্তু বাড়ির বউ-ঝি সে নাচ-দেখা হইতে বঞ্চিতা।

ছোট ছেলেরা এবং বুড়ি চাকরানিরা আসিয়া গিন্নিদের নিকট গল্প করে,—ভালুকে খেমটা নাচ নাচে; থমকা নাচ নাচে। এমন করিয়া ভালুকওয়ালার সঙ্গে কুস্তি লড়ে; এমন করিয়া পাছাড় ধরে।—ইত্যাদি। এইসব গল্প শুনিয়া শুনিয়া কর্তার দুইজন অল্পবয়স্কা পুত্রবধূর সাধ হইল যে, একটু নাচ দেখিবেন। বেশিদূর যাইতে হইবে না, ছোট বউবিবির কামরার উত্তর দিকের জানালার ঝরোকা (খড়খড়ির পাখি) একটু তুলিলেই সুস্পষ্ট দেখা যায়।

যেই বধূদ্বয় ঝরোকা তুলিয়াছেন, অমনি তাঁহাদের চারি বৎসর বয়স্কা ননদ জোহরা দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল যে, সে-ও দেখিবে। একজন তাহাকে কোলে তুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন। জোহরা কখনও বাড়ির উঠানে নামিয়া কুকুর বিড়াল পর্যন্ত দেখে নাই,—এখন দেখিল একেবারে ভালুক। ভালুক কুস্তি লড়িতেছিল, তাহা

দেখিয়া জোহরা ভয়ে চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল! ভালুকের নাচ দেখা মাথায় থাকুক—এখন জোহরাকে লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

জোহরার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তাহার ভয় গেল না। রাত্রিকালে হঠাৎ চিৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে থরথর কাঁপে। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া সুদূর সদর জেলা হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে ডাক্তার আনিতে হইল। ডাক্তার সাহেব সকল অবস্থা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শিশু কোনোপ্রকারে ভয় পাইয়াছিল নাকি? কথা গোপন থাকে না, জানা গেল ভালুকের নাচ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল।

এদিকে কর্তা সন্ধান লইতে লাগিলেন, জোহরাকে ভালুক-নাচ দেখাইল কে? খেলাই আন্না প্রভৃতি সকলে একবাক্যে অস্বীকার করিল যে, তাহারা সাহেবজাদিকে ভালুকের নাচ দেখায় নাই। অবশেষে জানা গেল, বউ বিবিরা দেখাইয়াছেন। তখন তাঁহার ক্রোধ চরমে উঠিল। জোহরা মরে মরুক, তাহাতে কর্তার তত আপত্তি নাই, কিন্তু এই যে বাড়িময় রাষ্ট্র হইল যে, তাঁহার পুত্রবধূগণ বেগানা মরদের তামাশা দেখিতে গিয়াছিলেন তিনি এ লজ্জা রাখিবেন কোথায়? ছি! ছি! ভিন্নধর্মাবলম্বী সিভিল সার্জন ডাক্তারও শুনিয়া মৃদু হাসিলেন যে, বউয়েরা ভালুকের নাচ দেখিতে গিয়াছিলেন।

লাজে খেদে ক্রোধে অধীর হইয়া কর্তা বধূদের তলব দিলেন। মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বধূদ্বয় লজ্জায় অভিমানে থরথর কাঁপিতেছিলেন, (সেই মাঘ মাসের শীতেও) ঘামিতেছিলেন, আর পদতলস্থিত পাথরের মেঝেকে হয়তো বলিতেছিলেন :—

"ওমা বসুন্ধরা! বিদর গো ত্বরা—
তোমাতে বিলীন হই!"

তাই তো, পর্দানশিনদের ধরাপৃষ্ঠে থাকিবার প্রয়োজন কী? দন্ত কড়মড় করিয়া,— "বউমা'রা শুন তো—" বলিয়াই অতি ক্রোধে কর্তার বাক্‌রোধ হইল। তখন তাঁহার "গোস্বায় অজুদ কাঁপে, আঁখি হইল লাল"—তিনি বউমাদের বিনা লুনে চিবাইয়া খাইবেন, না, আস্ত গিলিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না!

[৩৭]

একবার পশ্চিম দেশ হইতে ট্রেন হাবড়ায় আসিবার সময় পথে বালী স্টেশনে তিনজন বোরকাধারিণী লোক স্ত্রীলোকদের কক্ষে উঠিল। কক্ষে আরও অনেক মুসলমান স্ত্রীলোক ছিল। ট্রেন ছাড়িলে পরও তাহারা সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল যে, নবাগতা তিনজন বোরকার নেকাব (মুখাবরণ) তুলিল না। তখন তাহাদের মনে সন্দেহ হইল যে, ইহারা না জানি কী করিবে। আর তাহারা লম্বাও খুব ছিল। খোদা খোদা করিয়া লিলুয়া স্টেশনে ট্রেন থামিলে যখন মেয়ে টিকেট কালেক্টার তাহাদের কামরায় আসিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে ঐ বোরকাধারিণীদের বিষয় বলিল।

টিকেট কালেক্টার তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে-না-হইতেই তাহাদের একজন স্টেশনের বিপরীত দিকে ট্রেনের জানালা দিয়া লাফাইয়া পলাইয়া গেল, তিনি "পুলিশ—পুলিশ" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে একজনকে ধরিয়া নেকাব তুলিয়া, দেখেন,—তাহার মুখে ইয়া দাড়ি,—ইয়া গোঁফ! তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য! বোরকার ভিতর দাড়ি গোঁফ!"

[৩৮]

আমার পরিচিতা জনৈকা শি-ডাক্তার মিস শরৎকুমারী মিত্র বলিয়াছেন, "বাবা! আপনাদের—মুসলমানদের বাড়ি গেলে আমাকে যা নাকাল হতে হয়! না পাওয়া যায় সময়মতো একটু গরম জল, না পাওয়া যায় একখণ্ড নেকড়া!"

একবার তাহাকে বহুদূর হইতে একজন ডাকিতে আসিয়া জানাইল যে, বউ-বেগমের দাঁতে ব্যথা হইয়াছে। তিনি যথাসম্ভব দাঁতের ঔষধ এবং প্রয়োজন বোধ করিলে দাঁত তুলিয়া ফেলিবার জন্য যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখেন, দাঁতে বেদনা নহে,—প্রসব-বেদনা! তিনি এখন কী করেন? ভাগলপুর শহর হইতে জমগাঁও চারি ক্রোশ পথ। এতদূর হইতে আবার সেই একই ঘোড়ার গাড়িতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, কারণ ঘোড়া ক্লান্ত হইয়াছে। জমগাঁও শহরতলি—পাড়া-গ্রামের মতো স্থান, সেখানে ঘোড়ার গাড়ি কিম্বা পালকি পাওয়া যায় না।

কোনোপ্রকারে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া তৎকালীন উপযোগী যন্ত্রপাতি লইয়া পুনরায় জমগাঁও যাইতে যাইতে রোগিণীর দফা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। মিস মিত্র সে বাড়ির কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাকে অনর্থক ডাকা হইল কেন? উত্তরে কর্ত্রী বলিলেন, "পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারণীকে ডাকিতে হইল, সুতরাং তাহাকে দাঁতে ব্যথা না বলিয়া আর কী বলিতাম? তোবা ছিয়া! মর্দুয়াকে ও-কথা বলিতাম কী করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারণী যে, লোকের কথা বুঝেন না?"

[৩৯]

সমাজ আমাদিগকে কেবল অবরোধ-কারাগারে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। হজরতা আয়শা সিদ্দিকা নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন; সেইজন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ানো লাফানো ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচি-কর্ম করিতে থাকিবে—নড়িবে না। এমনকি দ্রুতগতিতে হাঁটিবেও না।

কোনো এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি আট বৎসরের বালিকা একদিন বিকালে উঠানে আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরে চালে ঠেকানো একটা ছোট মই আছে।

তাহেরার (সেই বালিকা) মনে কী হইল, সে অন্যমনস্কভাবে ঐ মইয়ের দুই ধাপ উঠিল। ঠিক সেই সময় তাহার পিতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাকে মইয়ের উপর দেখিয়া দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার হাত ধরিয়া এক হেঁচকা টানে নামাইয়া দিলেন।

তাহেরা পিতার অতি আদরের একমাত্র কন্যা—পিতার আদর ব্যতীত অনাদর কখনও লাভ করে নাই; কখনও পিতার অপ্রসন্ন মুখ দেখে নাই। অদ্য পিতার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ও রূঢ় হেঁচকা টানে সে এত অধিক ভয় পাইল যে, কাঁপিতে কাঁপিতে বে-সামাল হইয়া কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলিল!

অ-বেলায় স্নান করাইয়া দেওয়া হইল বলিয়া এবং অত্যধিক ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল বলিয়া সেই রাত্রে তাহেরার জ্বর হইল। একে বড়ঘরের মেয়ে, তায় আবার অতি আদরের মেয়ে, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। সুদূর সদর জেলা হইতে সিভিল সার্জন ডাক্তার আনা হইল। সেকালে (অর্থাৎ ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে) ডাক্তার ডাকা সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাক্তার সাহেবের চতুর্গুণ দর্শনী, পালকি ভাড়া, তদুপরি বত্রিশজন বেহারার সিধা ও পান তামাক যোগান—সে এক বিরাট ব্যাপার।

এত যত্ন সত্ত্বেও তৃতীয় দিনেও তাহেরার জ্বর ত্যাগ হইল না। ডাক্তার সাহেব বেগতিক দেখিয়া বিদায় হইলেন। পিতার রূঢ় ব্যবহারের নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর দিয়া তাহেরা চিরমুক্তি লাভ করিল! (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।)

[৪০]

এক ধনীগৃহে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ধুমধাম হইতেছিল। বাড়িভরা আত্মীয় কুটুম্বিনীর হট্টগোল—কিছুরই অভাব নাই। নবাগতদিগের জন্য অনেক নূতন চালাঘর তোলা হইয়াছে। একদিন ভরা-সন্ধ্যায় কী করিয়া একটা নূতন খড়ের ঘরে আগুন লাগিল। শোরগোল শুনিয়া বাহির হইতে চাকর-বাকর, লোকজন আসিয়া দেউড়ির ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, আর বারংবার হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, পরদা হইয়াছে কি না—তাহারা অন্দরে আসিতে পারে কি না? কিন্তু অন্তঃপুর হইতে কে উত্তর দিবে? আগুন দেখিয়া সকলেরই ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গিয়াছে। এদিকে আগুন-লাগা ঘরের ভিতর বিবিরা বলাবলি করিতেছেন যে, প্রাঙ্গণে পরদা আছে কি না,—কোনো ব্যাটাছেলে থাকিলে তাঁহারা বাহির হইবেন কী করিয়া?

অবশেষে এক বুড়া বিবি ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আরে ব্যাটারা! আগুন নিবাইতে আয় না! এ সময়ও জিজ্ঞাসা—পরদা আছে কি না?"

তখন সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া আগুন নিভাইতে আসিল। কিন্তু আগুন-লাগা ঘরের বিবিরা বাহিরে যাইতে গিয়া যেই দেখিলেন, প্রাঙ্গণ পুরুষমানুষে ভরা, অমনি তাঁহারা পুনরায় ঘরে গিয়া ঝাঁপের অন্তরালে লুকাইলেন। সৌভাগ্যবশত গোটাকয়েক সাহসী তরুণ যুবক বিবিদের টানা-হেঁচড়া করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। নচেৎ তাঁহারা সেইখানে পুড়িয়া পসেন্দা কাবাব হইতেন!

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর গত ১৩৩৫ সনে লিখিয়াছেন :—সেকালের পর্দা।—আমি যে সময়কে সেকাল বলিয়াছি তা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগ নয়, কিন্তু সে আমাদের যৌবনকালের কথা—এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। সে সময় আমরা পর্দার যেরকম কঠোর, তথা হাস্যকর ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, সে সকল দৃশ্য এখনও আমার চোখের সম্মুখে ছবির মতো জাগিয়া আছে। তারই গুটিকয়েক দৃশ্যের সামান্য বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিব।

সেই সময় একদিন কীজন্য যেন হাবড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম। আমি তখন কলেজে পড়ি। স্টেশনের প্লাটফরমে গিয়ে দেখি কয়েকজন বরকন্দাজ যাত্রীর ভিড় সরিয়ে পথ করছে। এগুতে সাহস হল না; হয়তো কোনো রাজা-মহারাজা গাড়িতে উঠবেন তারই জন্য তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিরীহ যাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে! এই ভেবে রাজা-মহারাজার আগমন-প্রতীক্ষায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিন চার মিনিট হয়ে গেল, রাজা আর আসেন না। শেষে দেখি কিনা—একটা মশারি আসছেন। মশারির চার কোণা চারজন সিপাহি ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। আমি তো এ দৃশ্য দেখে অবাক—এ ব্যাপার তো পূর্বে কখনও দেখি নাই। আমার পাশেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এমন ক'রে একটা মশারি যাচ্ছে কেন?" তিনি একটু হেসে বললেন, "আপনি বুঝি কখনও মশারির যাত্রা দেখেন নাই? দেখছেন না কত সিপাহি সান্ত্রি যাচ্ছে! বিহার অঞ্চলের কোন্ এক রাজা না জমিদারের গৃহিণী ঐ মশারির মধ্যে আবরু রক্ষা করে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন। বড়মানুষের বৌ কি আপনার আমার সুমুখ দিয়ে আর দশজনের মতো যেতে পারেন, তাঁরা যে অসূর্যম্পশ্যা!" এই বলেই ভদ্রলোকটি হাসতে লাগলেন। আমি এই পর্দার বহর দেখে হাস্য সংবরণ করতে পারলাম না। হাঁ, এরই নাম পর্দা বটে—একেবারে মশারি যাত্রা।

আর একবার কী একটা যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা ছিল। লোক-সমারোহ দেখবার জন্য এবং এ বৃদ্ধবয়সে বলেই ফেলি, গঙ্গাস্নান করে পাপ মোচনের জন্যও বটে, বড়বাজারে আদ্য-শ্রাদ্ধের ঘাটে গিয়েছিলাম। তখন শীতকাল, স্নানের সময় অপরাহ্ণ পাঁচটা।

ঘাটে দাঁড়িয়ে লোক-সমারোহ দেখছি, আর ভাবছি এই দারুণ শীতের মধ্যে কেমন ক'রে গঙ্গাস্নান করব। এমন সময় দেখি ঘেরাটোপ আগাগোড়া আবৃত একখানি পালকি ঘাটে এল। পালকির চার কোণ ধ'রে চারজন আর্দালি, আর পালকির দুই দুয়ার বরাবর দুইটি দাসী। বুঝতে বাকি রইল না যে কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিণী বা কন্যা বা পুত্রবধূ স্নান করতে এলেন। বড়মানুষের বাড়ির মেয়েরা এমন আড়ম্বর করেই এসে থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নেই।

কিন্তু তারপর যা দেখলাম, হাস্যরসের এবং করুণ-রসের একেবারে চূড়ান্ত। আমি মনে করেছিলাম, গঙ্গার জলের কিনারে পালকি নামানো হবে এবং

আরোহিণীরা অবতরণ ক'রে গঙ্গাস্নান করে আসবেন। কিন্তু, আমার সে কল্পনা আকাশেই থেকে গেল! দেখলাম বেহারা মায় আর্দালি দাসী দুইটি—পালকি নিয়ে জলের মধ্যে নেমে গেল। যেখানে গিয়ে পালকি থামল, সেখানে বোধ হয় বুক-সমান জল। বেহারারা তখন পালকিখানিকে একেবারে জলে ডুবিয়ে তৎক্ষণাৎ উপরে তুলল এবং তারপরেই পালকি নিয়ে তীরে উঠে এসে, যেভাবে আগমন, সেইভাবেই প্রতিগমন। আমার হাসি এল পালকির গঙ্গাস্নান দেখে; আর মনে কষ্ট হতে লাগল, পালকির মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অবস্থা স্মরণ ক'রে। এই শীতের সন্ধ্যায় পালকির মধ্যে মা-লক্ষ্মীরা ভিজে কাপড়ে হি-হি ক'রে কাঁপছেন। এদিকে তাঁদের স্নান হল, তা তো দেখতেই পেলাম। এরই নাম পর্দা!—

সেন মহাশয় পালকির 'গঙ্গাস্নান' দেখিয়া হাসিয়াছেন। আমরা শৈশবে চিলমারীর ঘাটে 'পালকির ব্রহ্মপুত্রনদের স্নান' শুনিয়া হাসিয়াছি। পরে ভাগলপুরে গিয়া পালকির রেলভ্রমণের বিষয় শুনিয়াছি।

একবার একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া নববিবাহিতা বালিকার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে জুন মাসে রৌদ্র কীরূপ প্রখর হয়, তাহা সকলেই জানেন।

জুন মাসে দিবা ৮ ঘটিকার সময় সে বালিকা নববধূকে মোটা বেনারসি শাড়ি পরিয়া মাথায় আধহাত ঘোমটা টানিয়া পালকিতে উঠিতে হইল। সেই ঘোমটার উপর আবার একটা ভারী ফুলের 'সেহরা' তাহার কপালে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পরে পালকির দ্বার বন্ধ করিয়া জরির কাজ করা লাল বানাতের ঘেরাটোপ দ্বারা পালকি ঢাকা হইল। সেই পালকি ট্রেনের ব্রেকভ্যানের খোলা গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় দগ্ধ ও সিদ্ধ হইতে হইতে বালিকা চলিল তাহার শ্বশুরবাড়ি—যশিদী!!

[৪২]

সেদিন (৭ই জুলাই ১৯৩১ সাল) জনৈক মহিলা নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটি বলিলেন :—

বহু বর্ষ পূর্বে তাঁহার সম্পর্কের এক নানিজান পশ্চিমদেশে বেড়াইতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যথাসময়ে টেলিগ্রাফযোগে তাঁহার কলিকাতায় পৌঁছিবার সময় জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন তুফানে সমস্ত টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং কলিকাতার রাস্তায় সাঁতার-জল ছিল! সুতরাং এখানে কেহ নানিজানের টেলিগ্রাম পাই নাই এবং হাবড়া স্টেশনে পালকি লইয়া কেহ তাঁহাকে আনিতেও যাই নাই।

এদিকে যথাসময়ে নানিজানের রিজার্ভ-করা গাড়ি হাবড়ায় পৌঁছিল, সকলে নামিলেন, জিনিসপত্রও নামানো হইল; কিন্তু পালকি না থাকায় নানিজান বোরকা পরিয়া থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই নামিতে সম্মত হইলেন না। অনেকক্ষণ সাধ্য-সাধনার পর নানাসাহেব ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তবে তুমি এই ট্রেনেই

থাকো, আমরা চলিলাম।' বেগতিক দেখিয়া নানিজান মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমি এক উপায় বলিয়া দিই, আপনারা আমাকে সেইরূপে নামান।" উপায়টি এই যে, তাঁহার সর্বাঙ্গে অনেক কাপড় জড়াইয়া তাঁহাকে একটা বড় গাঁটরির মতো করিয়া বাঁধিয়া তিন-চারি জনে সেই গাঁটরি ধরাধরি করিয়া টানিয়া ট্রেন হইতে নামাইল। অতঃপর তদবস্থায় তাঁহাকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

[৪৩]

এক বোরকাধারিণী বিবি হাতে একটা ব্যাগ-সহ ট্রেন হইতে নামিয়াছেন। তাঁহাকে অন্যান্য আসবাব-সহ এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার স্বামী কার্যান্তরে গেলেন। কোনো কারণবশত তাঁহার ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। এদিকে বিবিসাহেবা দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া এবং শরীরের কম্পন দেখিয়া ক্রমে লোকের ভিড় হইল। লোকেরা দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গের লোকের নাম বলুন তো, আমরা তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।" তিনি একবার আকাশে সূর্যের দিকে ইশারা করেন আর একবার হাতের ব্যাগ তুলিয়া দেখান। ইহাতে উপস্থিত লোকেরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হাসিতে হট্টগোল বাধাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হইয়াছে? ভিড় কেন?" ঘটনা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার নাম 'আফতাব বেগ', তাই আমার বিবি সূর্যের দিকে ইশারা করিয়া দেন আর হাতের বেগ (ব্যাগ) দেখাইয়াছেন।"

[৪৪]

জনাব শরফদ্দীন আহমদ বি.এ. (আলিগড়) আজিমাবাদী নিম্নলিখিত ঘটনাত্রয় কোনো উর্দু কাগজে লিখিয়াছেন। [আমি তাহা অনুবাদ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।] যথা :

গত বৎসর পর্যন্ত আমি আলিগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার স্টেশন বিশেষ একরূপ জাঁকজমকে ই.আই.আর. লাইনে অদ্বিতীয় বোধ হয়, সেইজন্য আমি প্রত্যহই পদব্রজে ভ্রমণের সময় স্টেশনে যাইতাম। সেখানে অন্যান্য তামাশার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ শতাব্দীর বোরকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলান, প্রত্যেক বোরকাই কোনো-না-কোনো প্রকার কৌতুকাবহ ছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি ঘটনা এখানে বিবৃত হইল।

প্রথম ঘটনা এই যে, একদিন আমি আলিগড় স্টেশনের প্লাটফরমে পায়চারি করিতেছিলাম, সহসা পশ্চাৎদিক হইতে আমার গায়ে ধাক্কা লাগিল। মুখ ফিরাইয়া

দেখিলাম যে, এক বোরকাধারিণী বিবি দাঁড়াইয়া আছেন; আর আমাকে শাসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মিয়া দেখে চলেন না?" তাঁহার কথায় আমার প্রবল হাসি পাইল, কারণ তিনি তো আমার পশ্চাতে ছিলেন, সুতরাং দেখিয়া চলা না-চলার দায়িত্ব কাহার, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি তাঁহাকে কেবল এইটুকু বলিলাম, "আপনি মেহেরবানি করিয়া বোরকার জাল চক্ষের সম্মুখে ঠিক করিয়া নিন" এবং হাসিতে হাসিতে অন্যত্র চলিলাম।

[৪৫]

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, একদিন আবার আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত আলিগড় স্টেশনে তামাশা দেখায় মশগুল ছিলাম। এমন সময় আমাদের সন্নিকটে একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম, কোনো শিশু আমাদের অতি নিকটে চেঁচাইতেছে। কিন্তু এদিক-সেদিক দেখিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার বন্ধুরা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যেহেতু বোরকা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাই আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শেষে দেখি কি, এক বোরকাধারিণী বিবি যাইতেছেন, তাঁহারই বোরকার ভিতর হইতে শিশুর রোদনের শব্দ আসিতেছে!

ঘটনা ছিল এই যে, বিবিসাহেবা শিশুকে বোরকার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; সে গরমে অস্থির হইয়া চিৎকার করিতেছিল। তাই কেহ শিশুকে দেখিতে পায় নাই, কেবল কান্না শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। আমি বন্ধুদের ঐ তামাশা দেখাইয়া দিলাম। আর হাসিতে হাসিতে আমাদের যে কী দশা হইল তাহা আর কী বলিব?

[৪৬]

আমি পূর্বের ন্যায় আবার একদা আলিগড় স্টেশনের প্লাটফরমে পায়চারি করিতেছিলাম। সম্মুখে এক 'সফেদ গোল' (সাদা দল) আসিতে দেখিলাম। নিকটে আসিলে দেখিলাম, আগে আগে এক প্রবীণ ভদ্রলোক একহাতে পানদান অপর হাতে পাখা লইয়া আসিতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে কয়েকটি বোরকাধারিণী পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া মিলিত হইয়া আসিতেছেন। এই কাফেলাটি অধিক দূরে না যাইতেই এক মাল-ঠেলা গাড়ির সম্মুখীন হইল। উহার সহিত টক্কর খাইয়া এক বিবি যেই পড়িলেন, অমনি সমস্ত পার্টি তাঁহার সহিত গড়াইল।

সন্ধ্যার সময়, গাড়ি আসিতেছিল, যাত্রীদের হাঙ্গামা ছিল—এমত স্থলে প্লাটফরমের উপর ঐরূপ আশ্চর্য জিনিস পড়িয়া থাকিতে দেখিলে কে না অগ্রসর হইয়া দেখিবে? অতি শীঘ্র বেশ একটা ভিড় জমা হইল। প্রত্যেকেই ভূপতিতাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল; কিন্তু স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে কে? সঙ্গের বৃদ্ধ

ভদ্রলোকটির জন্য আরও দুঃখ হইতেছিল; বেচারা একা, আর এই বিপদ! শেষে আমি বলিলাম, 'হজরত! আপনিই উহাদের তুলুন না; দেখুন তো বিবিদের কোথাও আঘাত্ লাগে নাই তো?'

বেচারা যখন তাঁহাদের তুলিতে লাগিলেন, আমি দেখিলাম যে বিবিরা আপন আপন বোরকা পরস্পরের বোরকার সহিত বাঁধিয়া লইয়াছিলেন এবং অগ্রবর্তিণীর বোরকার দামন ধরিয়া সকলেই চক্ষু বুজিয়া চলিতেছিলেন! এখন আমার সম্মুখে এই সমস্যা ছিল যে, অগ্রবর্তিণী বিবি এই মাল-ঠেলা গাড়ি দেখিলেন না কেন যে, এ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল? আমি তাঁহার বোরকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার বোরকার জাল,—যাহা চক্ষের সম্মুখে থাকা চাই, তাহা মাথার উপর পিছনে সরিয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বিবিসাহেবা কেবল আন্দাজে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন।

এখন অবস্থা এই হইয়া দাঁড়াইল যে, বেচারা 'বড়ে মিয়াঁ' একজনকে উঠাইতে গেলে অপর সকলের ওপরই টান পড়ে,—সুতরাং প্রথম বিবি আবার সেই টানে 'বড়ে মিয়াঁ'র হাতছাড়া হইয়া যান। এইরূপে অনেক টানা-হেঁচড়ার পরে বিবিরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন।

[৪৭]

কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে :

"কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন!"

প্রায় তিন বৎসরের ঘটনা, আমাদের প্রথম মোটর-বাস প্রস্তুত হইল। পূর্বদিন আমাদের স্কুলের জনৈকা শিক্ষয়িত্রী, মেমসাহেবা মিস্ত্রিখানায় গিয়া বাস দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোটর ভয়ানক অন্ধকার... "না বাবা! আমি কখনও মোটরে যাব না।' বাস আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল,—বাসের পশ্চাতে দ্বারের উপর সামান্য একটু জাল আছে এবং সম্মুখদিকে ও উপরে একটু জাল আছে। এই তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জাল দুই টুকরা না থাকিলে বাসখানাকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' বলা যাইতে পারিত।

প্রথম দিন ছাত্রীদের নূতন মোটরে বাড়ি পৌঁছানো হইল। চাকরানি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—গাড়ি বড্ড গরম হয়,—মেয়েরা বাড়ি যাইবার পথে অস্থির হইয়াছিল। কেহ কেহ বমি করিয়াছিল। ছোট মেয়েরা অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন ছাত্রী আনাইবার জন্য মোটর পাঠাইবার সময় উপরোক্ত মেমসাহেবা মোটরের দ্বারের খড়খড়িটা নামাইয়া দিয়া একটা রঙিন কাপড়ের পরদা ঝুলাইয়া দিলেন। তথাপি ছাত্রীগণ স্কুলে আসিলে দেখা গেল,—দুই-তিন জন অজ্ঞান হইয়াছে, দুই-চারিজন বমি করিয়াছে, কয়েকজনের মাথা ধরিয়াছে, ইত্যাদি।

অপরাহ্ণে মেমসাহেবা বাসের দুই পাশের দুইটি খড়খড়ি নামাইয়া দুই খণ্ড কাপড়ের পরদা দিলেন। এইরূপে তাহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যায় আমার এক পুরাতন বন্ধু মিসেস মুখার্জি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্কুলের বিবিধ উন্নতির সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আপনাদের মোটর-বাস তো বেশ সুন্দর হইয়াছে! প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে, আলমারি যাচ্ছে নাকি—চারিদিকে একেবারে বন্ধ, তাই বড় আলমারি বলে ভ্রম হয়। আমার ভাইপো এসে বললে, 'ও পিসিমা! দ্যাখো'সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে।' তাই তো, ওর ভিতর মেয়েরা বসে কী ক'রে?"

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে চারি-পাঁচ জন ছাত্রীর মাতা দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, 'আপকা মোটর ত খোদা কা পানাহ্। আপ লাড়কীয়ো কো জীতে জী কবর মে ভর রহি হয়ঁ।" আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিলাম, "কী করি, এরূপ না হইলে তো আপনারাই বলিতেন, 'বে-পর্দা গাড়ি।' তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তব কেয়া আপ জান মারকে পর্দা করেঙ্গী? কালসে হামারী লাড়কীয়াঁ স্কুল মে নেহী আয়েঙ্গী।" সেদিনও দুই-তিনটি বালিকা অজ্ঞান হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ি হইতে চাকরানীর মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল যে, তাহারা আর মোটর-বাসে আসিবে না।

সন্ধ্যার পর চারিখানা ঠিকানা-রহিত ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরাজি চিঠির লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন, "Brother-in-Islam." বাকি তিনখানা উর্দু ছিল—দুইখানা বেনামী আর চতুর্থখানায় পাঁচজনের স্বাক্ষর ছিল। সকল পত্রের বিষয় একই—সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুই পার্শ্বে যে পরদা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ি বে-পরদা করে। যদি আগামীকল্য পর্যন্ত মোটরে ভালো ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিছ' 'পলীদ' প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন, এরূপ বে-পর্দা গাড়িতে কী করিয়া মেয়েরা আসে।

এ তো ভারি বিপদ,—

"না ধরিলে রাজা বধে,—ধরিলে ভুজঙ্গ!"

রাজার আদেশে এমন করিয়া আর কেহ বোধ হয়, জীবন্ত সাপ ধরে নাই! অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষ হইতে বলিতে ইচ্ছা করিল,—

"কেন আসিলাম, হায়! এ পোড়া সংসারে,
কেন জন্ম লভিলাম পর্দা-নশীন ঘরে!"

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র